প্রবাহ

তৃতীয় বর্ষ | ২০২২

নরসিংহ দত্ত কলেজ

১২৯, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

প্রবাহ

তৃতীয় বর্ষ | ২০২২

নরসিংহ দত্ত কলেজ

১২৯, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

ফোন ঃ +৯১৩৩২৬৪৩৮০৪৯, ফ্যাক্স ঃ +৯১৩৩২৬৪৩৪২৫৯

Email: principal@narasinhaduttcollege.edu.in

প্রবাহ (PRABAHA)
বার্ষিক কলেজ পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ, ২০২২

সম্পাদক :
ড: সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষা, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

সম্পাদকমণ্ডলী
অধ্যাপক বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার
শ্রীমতী কৃষ্ণা ব্যানার্জী
ড: রূপালী ধারা
শ্রী সিদ্ধার্থ সেন
ড: শ্রুতি লাহিড়ী
শ্রীমতী মৌমিতা ধর (দে)
ড: পম্পা চক্রবর্তী
ড: প্রদীপ কুমার তপস্বী
ড: নীলাদ্রি দে
ড: শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়
ড: সুতীর্থ সরকার
ড: সুমন কুমার মাইতি
ড: শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী আকবর আলি
ড: সৌমিত্র কুণ্ডু
শ্রী স্বয়মদীপ্ত দাস
শ্রীমতী জোরা বানু
শ্রী অমৃত বোস
শ্রী মিঠুন হাজরা

প্রচ্ছদ ভাবনায় :
ড: শম্পা সরকার
অধ্যাপক, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

অলঙ্করণ :
বুক স্পেস
booksspace2011@gmail.com

প্রবাহ

সম্পাদকীয় —ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় *(অধ্যক্ষা)*

প্রবন্ধ/নিবন্ধ :

৭ ✦ **দুয়ার খোলার ধ্বনি**
সুকল্যাণ মুখার্জি *(সেমেস্টার ফাইভ, বাংলা বিভাগ)*

৯ ✦ **Dowry System in India**
Debasmita Bhattacharya
(Sem 5, English Dept.)

১২ ✦ **What is Literature**
Dr. Subashis Chattopadhyay
(Assistant Prof. Eng Dept.)

১৬ ✦ **পরাধীন ভারতের সাক্ষী অ্যাকোয়েরিমে থাকা জীবন্ত মাছ**
অন্বেষা সুলতানা *(সেমেস্টার ফোর, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)*

১৭ ✦ **রবিঠাকুরের ছবি**
বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার
(এসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ)

২২ ✦ **সেক্যুলারিজম্ বনাম সিনক্রেটিজম্ : আমাদের ভারতবর্ষ**
রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
(এসোসিয়েট প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

কবিতা :

২৫ ✦ **বিপ্লব আসুক**
কুন্তল ধাড়া *(সেমেস্টার সিক্স, ইংরেজি বিভাগ)*

২৬ ✦ **রবিস্পর্শে মোড়া জোড়াসাঁকো**
তনু মজুমদার *(সেমেস্টার সিক্স, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ)*

২৭ ✦ **The Churn**
Jayita Ghosal Roy
(Assistant Professor, Anthropology)

২৮ ✦ **শিরোনামহীন**
কুন্তল কোলে *(সেমেস্টার সিক্স বাংলা বিভাগ)*

২৯ ✦ **নিস্তব্ধতার বাস্তব**
দেবস্মিতা ভট্টাচার্য্য *(সেমেস্টার ফাইভ, ইংরেজি অনার্স)*

৩৩ ✦ **Flight of Fancy**
Tiasha Golui *(Semester V, English Honours)*

৩৪ ✦ **ক্ষয়িত চাওয়া**
তিয়াসা সেনাপতি *(সেমেস্টার সিক্স, ইংরেজি অনার্স)*

৩৫ ✦ **বাড়িটা ছিল নিকষ কালো**
অভীক দাস *(সেমেস্টার সিক্স, ইংরেজি অনার্স)*

৩৬ ✦ **অপেক্ষা**
অভীক দত্ত *(সেমেস্টার ফোর, বাংলা বিভাগ)*

৩৬ ✦ **বৃষ্টি বিকেল**
অয়ন বর *(সেমেস্টার ফোর, বাংলা বিভাগ)*

৩৭ ✦ **স্বপ্নভঙ্গ**
মিঠুন হাজরা *(শিক্ষা সহায়ক)*

৩৮ ✦ **স্মৃতির সরণি বেয়ে**
সায়ন হাইত *(সেমেস্টার ফোর, রসায়ন স্নাতক)*

৩৯ ✦ Creative Blockage
Srimoyee Maiti *(Semester IV, English PG)*

গল্প :

৪০ ✦ **মানুষের ছায়া, ছায়ার মানুষ**
রক্তিম ভট্টাচার্য *(সেমেস্টার ফোর, ইংরেজি বিভাগ)*

৪৩ ✦ **আন্দোলন**
ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় *(অধ্যক্ষা)*

৪৮ ✦ **রসায়নে খুন**
অয়ন পেখুয়া *(সেমেস্টার ফোর, রসায়ন বিভাগ)*

৫২ ✦ **অভিশপ্ত কলম**
বীরেশ্বর ধানকী
(সেমেস্টার সিক্স, রসায়ন বিভাগ)

ছবি :

৫৪ ✦ প্রিয়াঙ্কা কাঁড়ার *(সেমেস্টার ফাইভ, বাংলা বিভাগ)*
৫৫ ✦ পর্ণা পাল *(সেমেস্টার থ্রি, বাংলা বিভাগ)*
৫৬ ✦ তিয়াসা পান *(সেমেস্টার টু, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)*
৫৭ ✦ তহসিন সাবা *(সেমেস্টার ফাইভ, ইংরেজি বিভাগ)*

সম্পাদকীয়

এক পা দু পা করে এগিয়ে চলেছে ‘প্রবাহ’। অব্যাহত তার জয়যাত্রা। প্রবাহ—নরসিংহ দত্ত কলেজে পরিবারের মনন ও চিন্তনের অনন্ত গতিধারা। কিশোর মনের কাঁচা হাতের লেখা আর প্রাজ্ঞজনের অভিজ্ঞ চিন্তার প্রতিফলন। প্রবাহ এই দুই মেরুর সরল সংযোগ। গোটা পরিবারের বিভিন্ন বয়স ও স্তরের সদস্যদের শৈল্পিক উদ্ভাবনা নিয়ে প্রবাহ রত্নাকর। শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষের দর্পণ এই প্রবাহ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে বৈচিত্র্যময় পরিবেশনায়, যার বেশির ভাগটা জুড়ে আছে আগামীর সৃষ্টিধর পথিকের দল। যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে এই পত্রিকা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ভোরের আলো দেখতে পেরেছে তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। অভিনন্দন জানাই নরসিংহ দত্ত কলেজ পরিবারকে। স্বাগত জানাই সৃজনের এই নতুন অধ্যায়কে।

দুয়ার খোলার ধ্বনি

সুকল্যাণ মুখার্জি *(সেমেস্টার ফাইভ, বাংলা বিভাগ)*

****

শৈশবকাল থেকেই মা-ঠাকুমার মুখে শুনতাম রথযাত্রা মানেই দুর্গোৎসব দরজায় কড়া নাড়ছে। এই কথাটি কর্ণগহ্বরে প্রবেশমাত্রই এক অনাবিল আনন্দের উদয় হত। শুরু হত ঘন ঘন ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ রাখবার পালা, শুরু হত 'বাজল তোমার আলোর বেণু' কিংবা 'জাগো দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' এর মত অনবদ্য গানগুলি শোনার অপেক্ষা (সেই সময় ইউ টিউবের জনপ্রিয়তা না থাকায় এসব গান ইচ্ছেমতো শোনা যেত না।) দৈনন্দিন ব্যস্ততার জীবনে ক্যালেন্ডারে দিন গোনার পাঠ বহু আগেই চুকে গেছে। এখন ক্যালেন্ডারে চোখ রাখলে মনে হয় তারাই যেন আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকে আর উৎসবের তারিখগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে আমাদের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে আর জানান দেয় 'মা আসছেন....।' এবার অন্তত ক্যালেন্ডারে তাকিয়ে দেখতেই হবে অষ্টমী তিথি শুরু-শেষ কিংবা সন্ধিপূজোর ক্ষণ।

বাঙালি তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী প্রথাগত শিক্ষার ব্যাপারে যাবতীয় উদ্যোগ নিতে সর্বদা তৎপর অথচ বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নেপথ্যে যে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে সেই বিষয়ে চর্চায় উৎসাহী মানুষজনের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাই এর ফলস্বরূপ। ধীরে ধীরে বাংলার উৎসবগুলি হয়ে উঠছে অন্তঃসারশূন্য, উদ্দেশ্যহীন। যথারীতি শারদীয়া উৎসবের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

শারদীয়া দুর্গাপূজার মণ্ডপে ষষ্ঠীর বোধন থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত যা যা নিয়ম পালিত হয় প্রতিটিই গভীর তত্ত্ববহুল বা তাৎপর্যপূর্ণ।

শাক্ত পদাবলীতে দ্বিজ রাধিকাপ্রসন্নের মেনকা বলছেন—

"কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে
কি জানি কি রূপে ছিল বিল্বমূলে।"

আমরা জানি, দেবী দুর্গার বোধন সম্পন্ন হয় বিল্ববৃক্ষমূলে। এই বিল্বমূলে বোধন প্রকৃতপক্ষে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। দেবী দুর্গা দেহের মূলাধারচক্রে অবস্থান করেন কূলকুণ্ডলিনী শক্তি রূপে। তাই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা একান্ত প্রয়োজন। রামপ্রসাদ বলছেন—

"রত্নাকর নয় মূল্য কখন দু-চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কূলকুণ্ডলিনীর কূলে।।"

কূলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতে হলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করলে চলবে না। মনকে শাসন করে ইন্দ্রিয়ের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে।

শারদীয়া দুর্গোৎসবের অন্যতম বিশেষ অনুষ্ঠান হল নব পত্রিকার প্রবেশ ও স্থাপন। বোধনের মাধ্যমে ভক্তের আত্মচেতনা উজ্জীবিত হয়। কূলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে চেতনার সঞ্চার হয়। সেই চৈতন্য জগতের সর্বত্র ভগবতীকে দর্শন করতে শেখায়। তাই নব পত্রিকার পূজার মাধ্যমে ভক্ত প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরসত্তাকে খুঁজে পায়। নব পত্রিকার নয়টি গাছে দেবী নানারূপে বিরাজ করেন। কলাগাছে ব্রহ্মাণী, বেল গাছে শিবা, কচু গাছে কালিকা, হলুদ গাছে দুর্গা, মানকচু গাছে চামুণ্ডা, ধান গাছে মহালক্ষ্মী, জয়ন্তী গাছে কার্তিকী, ডালিম বা দাড়িম গাছে রক্তদন্তিকা, অশোক গাছে শোকরহিতা অবস্থান করেন।

দেবী দুর্গার বিসর্জন প্রকৃতপক্ষে আদ্যাশক্তিকে নিজের হৃদয়ে স্থাপন করা। পূজার শুরুতে যে আত্মশক্তি জাগ্রত করে বাহ্যিক পূজার আয়োজন করা হয়েছিল সেই আদ্যাশক্তি মহামায়াকেই অন্তরে পুনরায় পূর্ণরূপে স্থান দেওয়ার নামই বিসর্জন। তাই বিসর্জনকালে দেবীর উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয়—

উত্তর শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্বতবাসিনি।
ব্রহ্মযোনি সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্।।

শাক্ত পদকর্তাগণ মহাশক্তির আরাধনা করে জীবন সংগ্রামের রসদ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। কবি নজরুল দেবী ভগবতীকে শান্ত, শিশুকন্যা উমা রূপকে ছাপিয়ে দশ প্রহরণধারিণী রূপকে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন—

"অসুরবাড়ি ফেরত এ মা শ্বশুরবাড়ি ফেরত নয়
দশভুজার করিস পূজা ভুলরূপে সব জগৎময়।
নয় গৌরী নয় এ উমা মেনকা যার খেত চুমা
রুদ্রাণী এ, এ যে ভূমা একসাথে ভয়-অভয়!"

দেবী দুর্গার দশপ্রহরণধারিণী মহিষমর্দিনী রূপটি অনুধ্যান করলে আমরা শরীরে ও মনে প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারব। দেবী তার বাম পদ অসুরের বুকে রেখেছেন এবং ডান পদ সিংহের পিঠে রেখেছেন। মহিষাসুর এখানে তমোগুণের প্রতীক। তমোগুণগুলি হল আলস্য, বিবেকভ্রংশতা, বুদ্ধিবিপর্যয়। এই তমোগুণকে দেবী ভগবতী ত্রিশূল হস্তে নাশ করেছেন। অন্যদিকে সিংহ হল রজঃগুণের প্রতীক। রজঃগুণগুলি হল—লোভ, কামপ্রবৃত্তি ও বিষয়স্পৃহা। সিংহের পিঠে দক্ষিণপদ স্থাপন করে দেবী রজঃগুণকে দমন করছেন। তমোগুণের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সঠিক জ্ঞানের উদয় হয় না। অজ্ঞানতাই সমাজের সর্বপ্রকার বিপর্যয়ের মূল।

বাংলায় দুর্গাপূজা বহু প্রাচীন। পাল যুগেও চণ্ডীমূর্তি ও মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির সন্ধান মেলে। মধ্যযুগের 'চণ্ডীমঙ্গাল'-এ দশভুজা চণ্ডীর বর্ণনা থেকে শারদীয়া দুর্গামূর্তির জনপ্রিয়তা স্পষ্ট বোঝা যায়। মোঘল শাসনের পতনের পর বাংলায় অত্যাচারী নবাবদের আগমন ঘটে। মাত্রাতিরিক্ত জমিদারি শোষণের ফলে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষ শক্তিদেবীর শরণাপন্ন হয়। সেই প্রেক্ষাপটে জন্ম নেয় একের পর এক শাক্তগীতি। আজও আমাদের দুর্গাপূজার জন্য সেই উদ্যম, উৎসাহ প্রয়োজন। মহাশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে বাংলার যুগপুরুষরা যে শান্তির বাণী প্রচার করে গিয়েছিলেন আমাদের উচিত সেই পথকেই লক্ষ্য করে এগিয়ে চলা। মহামায়ার শক্তি হৃদয়ে জাগিয়ে তুলে অর্ন্তজগৎ ও বর্হিজগতের শত্রুদের দমন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেবী দুর্গার দিগ্বিজয়ী রূপকে আমাদের আদর্শ করতে হবে। তবেই বাঙালির মানসচক্ষে অনুভূত হবে জগন্মাতার আগমনের শব্দ। সেদিন দুর্বলতার শিকলে আবদ্ধ বাঙালির মনের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে শোনা যাবে বিশ্বজননীর আগমনের মঙ্গালধ্বনি—

"তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি ওই গো বাজে হৃদয়মাঝে।"

Dowry System in India

Debasmita Bhattacharya
(Sem 5, English Dept.)

Marriage is an integral part of society, a source of joy and festivities as well as of new beginnings. Yet, one of the longest standing evils associated with marriage from a woman's point of view in the Indian society is the Dowry system. The root of a host of social atrocities against women, the custom of presenting dowry is the crudest expression of the male-dominance in the society.

Although the origin of the custom lies with parents -trying to assure financial stability for their daughters, in current perspective it has translated into parents paying up for the assurance of well-being of their daughters. In a more subtle perspective, one may define this custom as the unquestioned idea that the girl's family is inferior in standing with the boy's family, no matter what her qualities are. Thus they need to be on their best behaviour and offer lavish "gifts" to please the boy's family.

This exploitative system that has turned the custom of giving gifts and well wishes into a compulsory demand for money, respect and subjugation, is the one of the major contributing factors hindering the growth of the Indian society where being a woman is still viewed synonymous to being a burden.

Causes of Dowry System

1. **Greed Factor** : dowry demands often is exemplary of the collective greed of the society. Extortion in the name of social standing, compensation for the cost of groom's education, his financial stability is a key feature of Indian marriages. Demands are put forward shamelessly and are expected to be met with silence.

2. **Society Structure** : the dowry system is largely the manifestation of the patriarchal nature of the Indian society where men are considered superior to women in aspects of physical and mental capabilities. With the backdrop of such societal structure, women are often considered second-tier citizens, fit to assume only domesticated roles. Such perceptions are often associated of them being treated as a burden in economic terms first by the father and then by the husband. This feeling is further compounded by the dowry system which fuels the belief that girl child is a potential cause of drain of family finances.

3. **Social Constraints** : Aside from similar religious backgrounds, further constrains are imposed based on cast system and social status. Practices like caste endogamy and clan exogamy, has to be kept in mind while arranging a match. Preferred matches have to belong to the same caste, different clan and same or higher social standings. These limitations again severely deplete the pool of marriageable men leading to similar consequences for demanding dowry.

4. **Social Status of Women** : the inferior social standing of women in Indian society is so deep-rooted in the psyche of the nation, that this treatment of them as mere commodities is accepted without question, not only by the family but by the women themselves. When marriage is viewed as the ultimate achievement

for women, evil practices like dowry- takes its roots deeper in the society.

5. **Illiteracy** : lack of formal education is another cause for the prevalence of the dowry system. A large number of women are deliberately kept from schools either due to certain superstitions or from the belief that educating girls will take away from their eligibility as good wives.

Effects of Dowry System

● Injustice towards girls

Dowry bears a huge financial obligation for the bride's family. As a consequence, a girl child is viewed a possible source of drain on the family's finances, ultimately an onus. This view evolves into gigantic proportions taking the shape of infanticides and feticides of girl child. Girls are often marginalized in the areas of education where boys of the family are given preference. They are thrust towards domestic chores from a very early age. A host of restrictions are imposed on them in the name of family honour and they are made to stay indoors.

● Violence against women

Contrary to hopeful parents, dowry is often not a one-time pay up. Demands are continuously made by the husband's family who consider the girl's family as a never-ending source of finance. Inability by the girl's family often leads to verbal abuse, domestic violence and even deaths. Brides being burned by the in-laws are hardly a novelty in this country. Continuous physical and mental torture instigates women to go into depression and commit suicide. 2016 figures indicate that in India, 20 women die every day due to dowry related issues.

● Gender inequality

The idea of paying dowry in order to get a girl married generates an increased sense of inequality among the genders, placing men superior to women. Young girls are kept from schools while their brothers are given access to education. They are regarded incompetent for roles other than housework and are often discouraged from taking up jobs. Their opinions are suppressed, not valued or ignored more often than not. Physical and behavioural restrictions are imposed on girls that are completely natural for boys.

● Loss of self-esteem in women

In a country which has experienced centuries of inferior attitude towards women, it is very hard to maintain a high level of self-regard if you are a woman. Naturally, women themselves are bound in the shackles of an idea that they are incapable of any contributions to the society. Their sense of self-worth hits rock bottom and they are increasingly subjugated to injustice.

Solutions to Dowry System

● Law

Several laws have been enacted to prohibit the practice of dowry and the injustice against women stemming from it. The Dowry Prohibition Act was passed on 20th May, 1961 with an aim to eradicate the evil practice from the society. The act declares not only the practice of accepting dowry unlawful, but also penalizes giving of the same. It includes property, valuable security like cash and jewellery exchanging hand during the marriage. Making demands of dowry is punishable by a minimum imprisonment of 5 years and a minimum fine of 15,000 rupees.

● **Enforcement**

It is never enough to just introduce acts and amend sections to fight against a social evil. This requires strict and ruthless enforcement of such laws. That aspect still leaves a lot to be desired. Although such allegations are taken very seriously by the authorities, lack of proper investigative procedures often leads to the accused going free. The government needs to ensure a zero-tolerance policy for such offenders and ensure enforcement of the law through systemic changes.

● **Education and self-dependence of women**

Education is not just required to find your vocation in life, it is essential to.gain eyes and cars to a world beyond the one you can immediately see. It is important or all of us to emphasize on educating the girls in order to fight widespread social evils like dowry. Knowledge of their rights will enable them to speak up against practice of dowry and ongoing marginalization. They will also be able to strive for self-dependence and not view marriage as their only salvation.

The practice of dowry is not only illegal but also unethical. Therefore, the conscience of society needs to be fully awakened to the evils of the dowry system so that the demand for dowry itself should lead to 'loss of face' in society for those who demand it.

What is Literature

Dr. Subashis Chattopadhyay
(Assist. Prof. Eng.)

****

While philosophers fight against each other for the defence of their conclusions about life; while political scientists keep squabbling about which system of governance is best for a nation and while historians' decisions can provoke riots, literature, to quote the poet W.H. Auden, "makes nothing happen":

For poetry makes nothing happen: it survives
In the valley of its making where executives
Would never want to tamper...
(In Memory of W. B. Yeats, W.H. Auden)

This is not entirely true. Literature allows children to remain children for ever, as in *Peter Pan* by J.M. Barrie, and can make Harry Potter fly on broomsticks. While scientists are certain about their discoveries; writers, poets, dramatists and literary critics only make truth-claims. They tell the truth, but tell it slant since any direct revelation would frighten both us and whatever we claim as the truth :

Tell all the truth but tell it slant...
The truth must dazzle gradually
Or every man be blind.
(Tell All the Truth..., Emily Dickinson)

Literature while making nothing happen in the sense that economists influence monetary policies and thereby break or make nations; literature forces us to rethink who we are. It compels us to come to terms with the fact that we are fundamentally lonely people seeking acceptance from others — we unlike AI, are beings who seek to come to terms with our brokenness and abjection. Further,literature helps us to break the chains of rationality and logic which repress us. We are not inert beings that we have to react to everything done to us. We do not come under the ambit of any of Newton's laws of inertia and motion.We can choose to not react to something done against us. This is the power of being human and our humanity is defined by literature. William Blake's painting, *Newton,* shows Newton as a heartless person lost within a sea of unending equations leading to inner emptiness and a sense of loss. Blaise Pascal after abandoning his empirical pursuits wrote: "The heart has its reasons which reason knows nothing of." Literature celebrates the glories of the human heart.We are human when we can experience the long loneliness within each of us as Dorothy Day shows in her book, *The Long Loneliness.* Literature taps into this unending loneliness which defines humanity and tells us that others before us were lonely too. They were so lonely that they wrote books hoping that someday in the future, after hundreds of years, someone yet unborn will understand them. Thus, were created classics. Literature is the howl of all humanity expressing our agony at finding out that we are all burnt-out cases:

I saw the best minds of my generation
destroyed by madness, starving hysterical
...burning for the ancient heavenly connection
to the starry dynamo in the machinery of
night... *(The Howl,* Allen Ginsberg)

This one theme, the theme of being mad with loneliness and 'burning' with the need to connect to others echoes *in The Heart is a Lonely Hunter* by Carson McCullers, *The Loneliness of the Long-Distance Runner* by Allan Sillitoe and earlier than both McCullers's novel and Sillitoe's story, in the novella, *Miss Lonelyhearts* by Nathanael West. Graham

Greene's *A Burnt-Out Case* is another moving tale of giving up in our indifferent and cooling world. If someone claims to be not lonely, to not have ever burnt out and never to have been slightly mad, then that person needs the healing touch of literature all the more. There is something immatureabout such a person. S/he has not grown up. In *A Midsummer Night's Dream,* we have these lines by Shakespeare :

> The lunatic, the lover and the poet
> Are of imagination all compact.

Machines learn through machine-learning and algorithms do not make good human beings. Scrum processes have something inhuman within them. Literature therefore deplores perfection and routines as other shrewd ways to escape facing life head on. Insanity and madness are entirely different from each other. We invented social media to escape this loneliness, but social media has increased our anxiety due to peer pressure and literature is the only remedy against this onslaught of information and friendship overload. Reading literature calms us.

Literature is more powerful than any history ever written because it allows us to enter someone else's mind, sane or insane—a wilderness indeed. The truth-claims of *Siddhartha* by the Nobel-winning Herman Hesse gives us a richer insight into the inner life of someone in search of himself than any extant Buddhist text. While we might read heavy tomes on the Roman Catholic Inquisition and study European historians for knowing the Middles Ages, Umberto Eco in his thriller, *The Name of the Rose,* shows us within a tensed plot the cruelties of the Inquisition and the day-to-day life of Europeans in the Middle Ages. We can sit the whole day reading archived papers detailing the Salem Witch Trials and write seriously about mass hysteria, but only when we read and watch Arthur Miller's *The Crucible,* that we understand what really happened in America's first colonies. The destructive power of colonisation cannot be understood through statistics: but if one reads *Blood Meridian, Or, The Evening Redness in the West* by Cormac McCarthy, we will get to know how the white man scalped Native American babies while imposing their total control over hitherto unconquered America. No subaltern scholar can show the plight of the downtrodden as U. R. Ananthamurthy did in his novel, *Samskara.*

Literature sometimes has a moral content. For instance, a child is taught that while the stars keep on twinkling in the sky, she may not ever get to reach them. In other words, we are taught to come to terms with the fact that as adults we have to be prepared for not getting everything we want in our lives. We are taught that the stars will twinkle up in the high heavens and no matter what our personal tragedies, life will go on :

> Why do the stars glow above
> Don't they know it's the end of the world
> It ended when I lost your love
>
> I wake up in the mornin' and I wonder
> Why everythings the same as it was
> I can't understand, no
> I can't understand...

(Why Does the Sun Keep on Shining, popularised by Skeeter Davis, originally by Sylvia Dee and Arthur Kent)

Or,

As William Bourdillon wrote :

> The mind has a thousand eyes,
> And the heart but one;
> Yet the light of a whole life dies
> When love is done.

A life in letters is defined by training ourselves to feel the entire gamut of emotions.

Only when we can love and lose others, we will not sneer at either Skeeter Davies or William Bourdillon. Only when we experience a feeling of not having a soul, that we can begin to understand, say, Manju Kapur's novel,A *Married Woman.* Books on existentialism speak of ennui and religious texts speak of acedia, but the nature of these abstractions are clarified through literature.

We pray to *The God of Small Things as* Arundhati Roy points out in her eponymous lyrical novel since our personal losses are more important to us than what is happening in the larger world. What does one do when one's little hopes and loves and friendships are destroyed by the juggernaut of destiny? We can only find peace in remembering Auden's lines from his

Funeral Blues:

The stars are not wanted now; put out every one,
Pack up the moon and dismantle the sun,
Pour away the ocean and sweep up the wood;
For nothing now can ever come to any good...

Literature forces us to value the small things in our lives. Those whom we cherish and love, one day they will be no more, and neither shall we. Then nothing will console us except the sorrows of those before us. In other words, literature is the therapy of sorrow.

Literature is against all ideologies and narratives of power. When we delude ourselves that we are absolutely right about our own self-serving beliefs, literature gently reminds us that our minds are playing tricks with us. George Orwell was once seduced by the dream of equality and then he realised how quickly utopias can turn into dystopias: "All animals are equal, but some animals are more equal than others" *(Animal Farm).* He realised the power of ideologies taking over our lives too late; just before he was dying. His prescience in his novel, *1984* now has turned real. *Demons* by Fyodor Dostoevsky and *The Gulag Archipelago: An Experiment in Literary Investigation* by Aleksandr Solzhenitsyn show us through high art, the results of being ideologically inflexible and not realising what the Marxist critic Terry Eagleton realised. Ideologies are the last refuge of those fleeing self-knowledge.

Just because someone has written about the rights of women, or about her own nation's glory or about a revolution, books do not automatically become literature. They need to be serious and have a sublimity which calls out to our hearts' deepest longings.What we cannot relate to ourselves, is certainly not literature for us. It does not matter whether hundred others are praising it online and ten critics are writing about it in learned journals. In fact, one has to ask the question, that if a book is so popular, is it literature in the first place? Because literature is not for the masses. Mass media, news and politics and the reductive discourses of the various human and empirical sciences being transitory in nature are for public consumption. They are certainly not literature. Literature, on the other hand, is not a mechanical production for the consumption by all.We might glimpse the beauty inherent in literature which had one kind of meaning a hundred years ago and will have another kind of meaning to another set of future readers hundred years from now. While new developments in the empirical sciences prove older assumptions wrong; while new archaeological discoveries destabilise accepted historical facts, and new voices of reason argue against older voices which once sounded reasonable and while, all things change, the literary artefact never changes. It is, impossible as it sounds, ahistorical. It is as if we are in the presence of the eternal. Anything which does not have this quality of permanence is not literature. Therefore, another quality of

literature is its ability to escape all historically and ideologically motivated critical pressures. If anyone claims to understand literature, then either the book in question was never literature in the first place, or, the reader is childish enough to think she has understood while actually she has been waylaid by the what the literary critic Cleanth Brooks termed the heresy of paraphrase'. Arthur C. Clarke's *2001: A Space Odyssey* will always remain a bestseller and a classic work of literature even when we begin to travel across galaxies. Strange, but true, science-fiction writers tend to get at the scientific discoveries much before scientists do.

We need to touch upon another point regarding literature before we end this essay. Generally speaking, if one cannot understand a book then it is filled with jargon and the style must be either convoluted or pretentious. Whatever it is, it is not literature. Literature is written in crisp and clear language and avoids bombast. What Martin Heidegger says in his notoriously difficult book, *Being and Time,* Marcel Proust said in simple language in his series of novels which make up his ln *Search of Lost Time.* No history book can tell us of the difficulties of the first expeditions to the Arctic as Dan Simmons tells it in his *The Terror.* Yet literature is neither philosophy, nor history. It is always open to the human mystery of being wrong. We are all fallible. As Shakespeare put it long ago :

> If we shadows have offended,
> Think but this, and all is mended,
> That you have but slumbered here
> While these visions did appear.
> *(A Midsummer Night's Dream)*

We are all dreamcatchers and are asleep. Literature tries to wake us up. No wonder then that in this age of measuring all things by their utility, Derek Attridge had to reaffirm the power of literature in his book, *The Singularity of Literature.* Attridge's book itself is literature. This is the power of clarity in writing. Perhaps Plato alone understood the power of literature in the Western world. Otherwise, he would not have insisted on banishing poets from future republics. It is a testimony to the power of literature that Salman Rushdie had to be stabbed at New York and J.K. Rowling threatened online for condemning the stabbing as this essay was being completed. For few can sing the song the sirens sing, leave alone understand them. Plato and other fanatics sometimes catch up to sarcasm and on-your-face humour, for as T.S. Eliot wrote in a poem with a long name:

> I have heard the mermaids singing, each to each.
> I do not think that they will sing to me...

There is no time or space to write on this aspect of literature. It is an all-encompassing laughter which mocks all that pretend to be great and destroys all our self-illusions. But that is for another day and place.

Author Biodata :

The author teaches English in the Post Graduate and Undergraduate sections of the Department of English of this college. He has a Ph.D. in the Problem of Evil and American Horrors Literature from the University of Calcutta. Further, he has studied the Bible and Hindu canonical texts formally.

পরাধীন ভারতের সাক্ষী : একোরিয়ামে থাকা জীবন্ত মাছ

অন্বেষা সুলতানা *(সেমেস্টার ফোর, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ)*

****

METHUSELAH :

ভারত তখনও স্বাধীন হয়নি। দেশে তখনও ব্রিটিশ রাজ চলছে। তারও বেশ কিছুবছর আগে থেকেই তিনি রয়েছেন সশরীরে জীবিত রয়েছেন। তিনিই এখনও পর্যন্ত অ্যাকোরিয়ামে থাকা জীবিত মাছ—তার নাম মেথুসেলাহ (Methuselah)।

এই মাছটি তাজা ডুমুর খেতে পছন্দ করে এবং বিশ্বের প্রাচীনতম 'জীবন্ত অ্যাকোরিয়াম মাছ' বলে বিশ্বাস করা হয়।

এটি হল একটি 4 ফুট লম্বা (1.2 মিটার), 40 পাউন্ড (18.1 কেজি) অস্ট্রেলিয়ান লাংফিশ যা ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে সান ফ্রান্সিসকো জাদুঘরে আনা হয়েছিল।

ফুসফুস এবং ফুলকা সহ এটি একটি আদিম প্রজাতি, অস্ট্রেলিয়ান ফুসফুস মাছ এবং উভচর প্রানীর মধ্যে বিবর্তনীয় যোগসূত্র ছিল বলে মনে করা হয়।

বাইবেল এ মেথুসেলাহ ছিলেন নোহ্-এর পিতামহ এবং বলা হয় যে তিনি ৯৬৯ বছর বেঁচে ছিলেন। মেথুসেলাহ মাছটি ততটা প্রাচীন নয়। তবে ক্যালিফোর্নিয়া একাডেমি অফ সায়েন্স এর জীববিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এটি প্রায় নব্বই বছর বয়সী।

প্রচারের জন্য অপরিচিত নয় : সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকলে মেথুসেলাহ-এর প্রথম উপস্থিতি ছিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে।

এই অদ্ভুত প্রাণীগুলি সবুজ আঁশের সঙ্গে তাজা আর্টিকোক পাতার মতো দেখতে। বিজ্ঞানীদের কাছে স্থলজ এবং জলজ প্রাণীর মধ্যে একটি সম্ভাব্য 'নিখোজ লিঙ্ক' হিসেবে পরিচিত।

কয়েকবছর আগে পর্যন্ত, সবচেয়ে প্রাচীন অস্ট্রেলিয়ান লাংফিশটি শিকাগোর শেড অ্যাকোরিয়ামে ছিল। কিন্তু 'দাদা' নামের সেই মাছটি ২০১৭ সালে ৯৫ বছর বয়সে মারা যায়।

খাদ্যাভাস : অস্ট্রেলিয়ান এই লাংফিশটির প্রিয়তম খাবার হল তাজা ডুমুর (Fresh Figs)।

ক্যালিফোর্নিয়া একাডেমি অফ সায়েন্স এর সিনিয়র জীববিজ্ঞানী ও মৎস্যরক্ষক অ্যালান জান বলেছিলেন, "আমি আমার স্বেচ্ছাসেবকদের বলি, ভান করুন সে জলের নীচে থাকা একটি কুকুরছানা, খুব কোমল, ভদ্র কিন্তু অবশ্যই যদি সে ভয় পেয়ে যায় তার হঠাৎ শক্তি কমে যাবে, তবে বেশিরভাগ তিনি শান্ত।" মেথুসেলাহ মৌসুমী ডুমুরের স্বাদ তৈরি করেছে।

এড়াছাও তার খাদ্য তালিকায় রয়েছে—

(১) মাছ—4 capetin বা 5 white bait.

(২) 4 cut clams বা 6 prawns; carthworms

(৩) সবজি—Romaine lettuce

(৪) ফল—6 grapes, 3 halved figs, 5 blackberries

(৫) শুকনো খাবার—Algae tabs.

প্রজনন : মেথুসেলাহ খুবই আরামদায়ক জীবনযাপন করে। তারা তাদের প্রজনন ঋতুতে শক্তি সঞ্চয় করে। আগস্ট এবং নভেম্বর এর মাঝামাঝি তারা মিলিত হয়। প্রথমে পুরুষ ও স্ত্রী মাছ বৃত্তাকারে এগিয়ে আসে জলের পৃষ্ঠদেশে এবং ঘনঘন শ্বাস নেয়। তারপর স্ত্রী নীচে ঝাঁপ দেয় সেখানে, পুরুষ মাছটিকে অনুসরণ করে এবং ডিম পাড়ে তারপর পুরুষ মাছটি তা নিষিক্ত করে। ৩০ দিন পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় যা পরবর্তীকালে মেথুসেলাহ-এর ন্যায় বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

সংরক্ষণ :

1. এটি IUCN-এর Red list-এ বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে।

2. অস্ট্রেলিয়ান লাংফিশ মানুষের কারণে অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু সৌভাগ্যবশত তার সংখ্যা এখন স্থিতিশীল।

রবিঠাকুরের ছবি

বর্ণালী ঘোষদস্তিদার *(এসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ)*

****

১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য লিখেছিলেন তখন তাঁর শখ হয়েছিল সেটি চিত্রিত করার। প্রিয় ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডেকে বলেছিলেন কবিতাখানা চিত্রিত করে দিতে। সময়টা ইংরেজ উপনিবেশের কাল আর অবনীন্দ্রও তখন নেহাত ছেলেমানুষ। একদিকে দেখছেন ইংরেজ প্রভাবিত পশ্চিমী কোম্পানিপেইন্টিং অন্যদিকে ওরিয়েন্টাল বা দেশজ ছবি বলতে পরিবারের সংগ্রহে আছে রাজা রবিবর্মার ছবি।

অবনীন্দ্রনাথ এইসময় আপনমনে বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনে ছবি আঁকতেন। আর রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন "তুলি দিয়া যদি ছবি আঁকিতে পারিতাম তবে পটের উপর রং ও রেখা দিয়ে উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ।" খুব আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন চিত্রবিদ্যা আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হোত তাহলে একবার দেখাতুম আমি কি করতে পারতুম"....

এই মানুষটিই উনিশশো তেইশে রক্তকরবীর পাতায় আপনমনে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করতে করতে কাটাকুটি পরিশোধন পরিমার্জনের মধ্যে থেকে রেখায় রূপে অবিশ্বাস্যভাবেই কতকগুলি ফর্ম টেক্সচার ফুটিয়ে তুললেন। আসলে কবি কাটাকুটির কুশ্রীতা সইতে পারতেন না। তাদের সৌন্দর্যরূপ দিয়ে মুক্তি দিতে চাইতেন। এরপর পেরুর স্বাধীনতার শতবর্ষপূতি উপলক্ষ্যে কবি গিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ারেসে। সেখানে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্যে তাঁর থাকার কথা। ওকাম্পো লিখেছিলেন "ওঁর একটি খাতা পড়ে থাকতো টেবিলের পরে। না জানিয়ে কারুর ডায়েরি উল্টানো অনুচিত। কিন্তু কৌতুহলবশে খুলে দেখলাম। কলমের আঁচড়ের কাটাকুটি থেকে অদ্ভুত সব আকৃতি জেগে উঠেছে। কতকগুলো রেখার টান সূক্ষ্ম কালির আঁচড় থেকে জেগে উঠেছে নির্মাণ আর জ্যামিতিক কাঠামো।" ভিক্টোরিয়া স্তম্ভিত হয়ে যান কবির সাহিত্য চর্চার সমান্তরালে এই অভিনব গুণের পরিচয় পেয়ে। তিনিই সর্বপ্রথম ফ্রান্সে কবির চিত্রকলার প্রদর্শনী করার উদ্যোগ নেন।

রবীন্দ্রনাথ কোনদিন নিয়মতান্ত্রিক পথে ছবি আঁকা শেখেননি। কবিতায় তিনি ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। ছোটোবেলায় শুধুমাত্র পেয়েছিলেন সুরের আর ছন্দের শিক্ষা। বলেছিলেন "শিবের জটা থেকে যেমন গঙ্গা

করুণের বুকে আঁকা কঠিনের ছবি ('চিত্রলিপি')

নামে তেমনি করে আমার কাব্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে।” কিন্তু ছবি আঁকার ব্যাপারটা ছিল একেবারেই উল্টো। “রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে তারপর যতোই আকার ধারণ করে ততোই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে “কাটাকুটি পাণ্ডুলিপি সংশোধন থেকে আকস্মিক ভাবে এক একটি রূপ (form) জেগে ওঠা ছিল যেমন আকস্মিক তেমনিই বিস্ময়কর। বন্ধু ও ‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে বরীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন “দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনকরাজার লাঙলের ফালে যেমন জানকীর উদ্ভব। তারা আনাহূত এসে হাজির।”

অনেক আগে রবিঠাকুরের ছেলেবেলায় আঁকা মালতীপুঁতি বা হিসাব খাতার মার্জিনের পাশে কিছু আঁকিবুকি পাওয়া গিয়েছিলো। ইংরেজিতে একে বলে ডুডলস। লেখার কাগজে আশেপাশের মার্জিনে ডুডলস বা আঁকিবুকির অভ্যাস বহু শিল্পী বা চিন্তাবিদের থাকে। এই ডুডলস ঠিক ইচ্ছাকৃত নয় খামখেয়ালি চিন্তার উদ্ভট অসংলগ্ন রূপের আভাস। একটি বিন্দু বা বৃত্ত থেকে হয়তো তার যাত্রা শুরু হয়, তারপর এগিয়ে চলে তার আপন খেয়ালে। মনের আবেগ ভাবনা উত্তেজনা অজান্তেই কখন যে গড়ে তোলে খসড়া আকার বা নকশা। তবে এও ঠিক যে মনের অবচেতনে তা চালিত হয় না, রূপের ধারণা চোখ-হাত ও মস্তিষ্কের স্নায়ুকে নির্দেশ দেয়। কল্পনা ও নান্দনিক চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে রেখাকে। আগেও দেখা গেছে পাশ্চাত্যের বহু সৃজনশীল মানুষই তাঁদের পাণ্ডুলিপির আশেপাশে আঁকিবুকি কেটেছেন। উইলিয়াম দান্তে, হেনরিক ইবসেন, টমাস মান, লোরকা, কাফকা, ভ্যালেরি, ভের্লেন, হুগো অনেকের লেখার খাতাতেই এইরকম ডুডলস দেখা গেছে।

ফুল

এই পথেই চিত্রকর হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথামাফিক ছবি আঁকতে তিনি শেখেননি। কোনো আর্টস্কুলের ছাত্র হন নি। ফলে ছবি আঁকার মৌলিক ব্যাকরণও তাঁর খুব স্পষ্ট জানা ছিল না। শুধু পদ্য লিখতেন। ছোট থেকে তাই ছন্দোজ্ঞান ছিল প্রখর। আর ছিল শৈশব থেকেই ছবির সাহচর্য। পারিবারিক বন্ধু হ.চ.হ.-র (হরীশচন্দ্র হালদার) শিল্পকর্ম দেখে বড়ো হয়েছিলেন। গুণদাদার ছেলেমেয়েরা, দুই ভাইপো বিশেষ করে গগন ও অবন ছবি আঁকায় খুবই দক্ষ ছিলেন। ভাইঝি সুনয়নী, বিনয়নী তাঁরাও। অবনীন্দ্রনাথ কোম্পানী পেইন্টিং-এর বিলিতি মোহ থেকে প্রাচ্যদেশীয় পরম্পরায় ভারত শিল্পের আত্মার মুক্তি দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। গগনেন্দ্র আঁকতেন আলোছায়ার খেলা। সেইসঙ্গে কিউবিক আকৃতির মানুষ প্রকৃতি।

'পূরবী' বা 'রক্তকরবীতে' (১৯২৪) রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপির কাটাকুটির কুশ্রীতায় শ্রী ফেরাতে এক একটা জ্যামিতিক ফর্ম দিতে লাগলেন। প্রথমে দেখা দিল নক্সা। তারপর তার থেকে ফুটে উঠলো মানুষের মুখের আদল পশুপাখি জন্তু জানোয়ারের বিমূর্ত অবয়ব। নানা ধরনের ছবি আঁকতে লাগলেন কবি। কখনও কবিতার চিরচেনা কলম ফেলে রেখে টেনে নিলেন ক্যানভাস, রং তুলি ইজেল। আঁকলেন নিসর্গ মানুষের মুখ বা মুখোশ ফুলপাতা বা সূক্ষ্ম রেখার আঁচড়ের নকশা। সবচাইতে বড়ো কথা এই সময় রবীন্দ্রনাথ আটষট্টি বছরের প্রৌঢ়।

নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বছর বারো আগে। গোটা পৃথিবীতে কবি গদ্যকার চিন্তক দার্শনিক বৌদ্ধিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তখন তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন আবিষ্কৃত চিত্রকর সত্তা তাঁর নিজের কাছেও বিস্ময়কর লাগছে। সাদা পাতার ওপর কলমের বদলে তুলি চালনা তাঁর নিজের কাছেও কম রোমাঞ্চকর নয়। একটা সময় ছিল যখন একটু ছবি আঁকার বাসনায় তুলি চালিয়ে চালিয়ে হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু চিত্রদেবীর প্রসাদ পাননি। আর জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে সেই চিত্রকলার দেবী যখন আপনি এসে কবির কাছে ধরা দিলেন তখন কবি বিস্মিত বিমোহিত। বাছুরের প্রথম শিং গজালে যেমন সে সবকিছুকেই ঢুঁসিয়ে মারতে চায় বর্ষীয়ান কবিরও তেমনিই হল। জীবনের পড়ন্তবেলায় ছবি আঁকার নেশা তাঁকে পেয়ে বসলো। লিখলেন—

আমার খেয়ালে ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।"

পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে চিঠিতে লিখলেন,

"ছবি কোনোদিন আঁকিনি। আঁকবো বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এলো তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এই পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুটিয়ে দিলেন।"

আপনমনে ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎই আবিষ্কার করলেন "ওয়ার্ল্ড অফ জেশ্চার", "ওয়ার্ল্ড অফ মিনিং"। অবনীন্দ্রনাথ রবিকা-র ছবিগুলিকে বলতেন "ভলক্যানিক ইমপালস"....আগ্নেয়গিরির সুপ্তোত্থান। এতোদিন যে প্রতিভা ঘুমিয়েছিল জীবনসায়াহ্নে তা অকস্মাৎ জেগে উঠলো।

প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বেশিরভাগই বিমূর্ত। কালি কলমে স্কেচ করতেন। কিন্তু জোরালো গাঢ় রং ব্যবহারে আগ্রহ ছিল বেশি। ভালোবাসতেন ঘন নীল কালো হলুদ খয়েরি প্যাস্টেল কালার বা তেল রং-এর ঘনত্ব। খুব আধুনিক ছিল তাদের নির্মাণ। এযাবৎ কালে ভারতশিল্পের অন্য কোনো শিল্পী এতো অত্যাধুনিক ভাবনা ও বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকেন নি। আঁকলেন "গ্রোটেস্ক"। আদিম প্রাগৈতিহাসিক কালের বিপুলবপু অদ্ভুতদর্শন জানোয়ার, বিষন্ন নির্জনতায় ভরা নিসর্গ, ভুতুড়ে ঝুপসি ডালপালা মেলা ঝাঁকড়া গাছ। আর আঁকলেন রহস্যময় পুরুষ ও নারী। কবির পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মানবী অকালপ্রয়াত বৌঠান কাদম্বরীদেবীর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বময়ী মুখশ্রী আমৃত্যু কবিকে আকর্ষণ করতো। তাঁর অঙ্কিত নারীর মুখে বহু রবীন্দ্রগবেষক কবির প্রিয় বৌঠানের আদল খুঁজে পেয়েছেন।

প্রথম জীবনে ছবি আঁকার হাত নেই বলে আপশোস করতেন আর ছবি আঁকিয়ে আত্মীয় চেনা-পরিচিতদের কাছে নিজের বই-এর ছবি এঁকে দিতে অনুরোধ করতেন। প্রিয় দুই ভাইপো অবনঠাকুর, গগনঠাকুর ছাড়াও নন্দলাল, সুরেন কর, অসিত হালদার, দেবীপ্রসাদ অনেকেই বিভিন্ন সময়ে কবির কবিতা, গান, গদ্য ছবি এঁকে অলঙ্করণ করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদা, গীতাঞ্জলি, তোতাকাহিনী অলংকৃত করে দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। গগনেন্দ্রনাথ রক্তকরবীর মলাট আর জীবনস্মৃতির ধূসর স্কেচগুলি। আর সহজপাঠে নন্দলাল বসুর লিনোকাঠে খোদাইকর্মের গ্রাফিক্স এর আনন্দ শিশুবেলায় কে না পেয়েছে?

এই কবিই পরিণত বয়সে উপলব্ধি করলেন যে তাঁর মনে ঠাঁই পেয়েছে 'দৃষ্টির মহাযাত্রা'। সেই দৃষ্টির অভিযাত্রায় অভিনবরূপে প্রত্যক্ষ হয়েছে গাছপালা জীবজন্তু মানুষ। তারা চিত্রকরের নতুন সত্তাকে ঘোষণা করেছে। হেমন্তবালা দেবীকে চিঠিতে লিখছেন, "বাণীর চেয়ে গানের বেগ বেশি, গানের চেয়ে ছবির।"

নির্মলকুমারী মহলানবীশকে জানাচ্ছেন "শারীরিক শক্তি কমে আসছে। ছুটি নিতে চাই। ছবি দিয়ে রূপের খেলনা বানাই ঠিক বালকেরই মতো। "কবির মনে অনেকদিনের লক্ষ্মীছাড়া লুকিয়ে ছিল। তার বাঁধন গেল খুলে। সাহস গেল বেড়ে।"

রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছিলেন ১৯২৩ থেকে ১৯৪১ এই সময়টুকুকুর মধ্যে। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ছবির সংখ্যা বিপুল। ভারতীয় ছবিতে প্রথম অ্যাবস্ট্রাকশন আনেন তিনিই। তাঁর ছবি রেখায়-রঙে-উপজীব্য বিষয়ে

উটাকৃতি প্রাণী (কাগজে কালি ও জল রং))

এতোটাই আধুনিক যে ভারতীয় শিল্পের পরম্পরার সঙ্গো তার কোনো তুলনাই চলে না। তাঁর ছবির সঙ্গো সমালোচকরা পাশ্চাত্যের শিল্পী পল ক্লি বা ক্যান্ডিন্সিকির ছবির মিল খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু না। ভালো করে দেখতে গেলে কোনো পশ্চিমী শিল্পী চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেন নি। মিল যদি কিছু থেকেও থাকে তো তা নেহাতই কাকতালীয়।

মা ও ছেলে (কাগজে কালি ও জল রং)

"বিচিত্রিতা" গ্রন্থে সমকালের শিল্পীদের সঙ্গো এঁকেছিলেন অনেকগুলি ছবি। 'চিত্রলিপি' গ্রন্থে সংকলন করলেন নিজের লেখা। নিজের ছবি। 'সে' আর 'খাপছাড়া' নাতনী পুপেকে নিয়ে ছোটদের জন্য লেখা দুটি গ্রন্থের ছবিগুলিতে কবির কল্পনার দৌড় দেখলে অবাক হতে হয়। শুধুমাত্র কালির আঁচড়ে আঁকা এসব ছবি দেখলে এক ঝটকায় বাস্তবচারী মন পৌঁছে যাবে ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডে।

"পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি"তে কবি লিখেছিলেন "ছবির কর্তব্য হইতেছে নিজেকে 'প্রকাশ' করা। নিজেকে 'বোঝানো' নয়। সেরকমই কবির ছবি যেন ভাবনায়-আকারে-রেখায়-রঙে সবসময়ই বলে 'আমি আছি'। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, কোনো বিলিতি ইজমের নকলনবীশি ছাড়াও ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসের প্রথম আধুনিকতম শিল্পীর নাম যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর......এতে কোনো সংশয় নেই। 'সে' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তাই কবি লিখেছিলেন,

কিছু ভাষা দিয়ে
কিছু তুলি দিয়ে আঁকা
দিলাম উজাড় করে ঝুলি।

সেকুলারিজম বনাম সিনক্রেটিজম : আমাদের ভারতবর্ষ

রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় *(এসোসিয়েট প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)*

****

ইংরেজী ভাষায় 'Secularism' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা ব্যবহার করি 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। প্রসঙ্গত ইউরোপে পোপ-বিরোধী আন্দোলন থেকে 'সেকুলারিজম্' কথাটি জনপ্রিয় হয়, যার মর্মার্থ নিঃসন্দেহে ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু মনেরাখা প্রয়োজন ইংরেজী 'religion' কথাটির সঙ্গে 'আন্দোলনের' সংশ্রব আছে। যার সঙ্গে বঙ্গভাষায় 'ধর্ম' কথাটির একশো শতাংশ সাযূজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। একথা ঠিক যে 'Religion' এবং 'ধর্ম' এই দুটি প্রায় সমার্থক। ল্যাতিন শব্দ 'Religare' থেকে ইংরেজী religion কথাটি এসেছে যার অর্থ হল 'বন্ধন' বা 'Bond'। একইভাবে সংস্কৃত 'ধর্ম' কথাটি এসেছে 'ধৃ'-ধাতু থেকে, যার অর্থ হল ধারণ করা, যা সামাজকে ধারণ করে রাখে। কিন্তু বাস্তবে religion এসেছে আন্দোলনের হাত ধরে, শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা দেখা যাবে বিভিন্ন কালপর্বে খ্রীস্টধর্ম, ইসলামধর্ম, বুদ্ধিজম বা জৈনধর্ম এসেছে কোন একজন মসীহা বা 'ঈশ্বরের বরপুত্রের' হাত ধরে এবং কালক্রমে তা প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। পক্ষান্তরে 'ধর্ম' এদেশে পুরাণ-পূর্ব যুগে আবহমান কাল ধরে গণ্য হয়ে এসেছে একটা সাংস্কৃতিক বন্ধন হিসেবে, যা একটা জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন পদ্ধতি। way of life। 'হিন্দুত্ব' সেই অর্থে পাশ্চাত্যের মত কোন আন্দোলন জাত নয়, এটা একটা সংস্কৃতিক বন্ধন যা সমাজকে ধারণ করে, পাপ-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায় বোধ সম্পর্কে সচেতন করে। এই উপস্থাপনার মূল প্রতিপাদ্য হল এই বিষয়টি তুলে ধরা যে, যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজ বহু ধর্মের সহাবস্থান আমাদের জীবন ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিল। এখনো করতে পারে। ভারত কোন দিনই পাশ্চাত্যের অর্থে 'Secularism' এর প্রয়োজন অনুভব করেনি। কারণ তার অন্তরাত্মা হল সর্বধর্ম, সর্ব সংস্কৃতির সমন্বয় বা Syncretism'।

আমাদের দেশে পুরাণ-পূর্ব যুগে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মূলত 'ধর্মশাস্ত্রীয়' ধারা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে 'অর্থশাস্ত্রীয়' ধারা এসেছে। ধর্মশাস্ত্রীয় ধারা ধর্মকে মূলত দার্শনিক নিদান, সাংস্কৃতিক বন্ধন ও জীবনচর্যা হিসেবেই গণ্য করা হত। অনন্ত সাদাশিব আলটেকার, রামশরণ শর্মা কিংবা ইউ এন ঘোষালের লেখায় এই বক্তব্য পাওয়া যায়। বহুলচর্চিত 'হিন্দু' শব্দটি এসেছে উচ্চারণ বিভ্রাট থেকে। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার অবশিষ্টাংশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল গ্রীক অনুপ্রবেশকারীরা, যারা 'স' উচ্চারণে অপারগ ছিল। তাদের কষ্টলব্ধ উচ্চারণে 'সিন্ধু' হয়ে ওঠে 'Indus' এবং তা থেকে 'হিন্দু' কথাটির উৎপত্তি বলে প্রত্নতাত্ত্বিদদের একাংশ মনে করেন। ইউরোপীয় উচ্চারণের জটিল আবর্তে 'সিন্ধু সভ্যতা' হয়ে ওঠে Indus Vally civilization। এই অর্থে 'indus' বা 'হিন্দু' হয়ে ওঠে এক নির্দিস্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক-সামাজিক পরিচিতর দ্যোতক। অতএব, 'Hinduism' কোন অর্থেই পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা অনুসারে আন্দোলন-জাত 'religion' নয়, বরং a culture' বা 'a way of life—জীবন যাপন পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক বন্ধন। হ্যাঁ, অন্যান্য religion-এর মত 'হিন্দু ধর্ম' ও প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়—religion-এ পরিণত হয় অনেক পরে আদি শঙ্করাচার্য্যের সময় থেকে—বলা যায় অদ্বৈত বেদান্তের জনপ্রিতার সময় থেকে।

এই উপক্রমণিকার পর এবার আসি এই রচনার মূল বক্তব্যে। পুরাণ-উত্তর পর্ব থেকে হিন্দুধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বিকশিত হতে থাকলেও দীর্ঘ দিন আধুনিক যুগ পর্যন্ত, সাংস্কৃতি, স্থাপত্য, সামাজিক আচার এমনকি কথ্য ভাষার ক্ষেত্রেও সমন্বয়বাদ লক্ষ্য করা গেছে। তথাকথিত 'দীন-ই-ইলাহী'র কথা বাদ দিলাম, কবীর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, রামমোহন এরা সকলেই ছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়বাদের শক্তিশালী প্রবক্তা। তবু আমরা গলার শির

ফুলিয়ে 'সেকুলারিজমের' কথা বলি, সিনক্রেটিজম উপেক্ষা করি। আধুনিক ভারতের যে কোন প্রদেশে বা শহরে গেলে দেখা পাওয়া যাবে ব্রিটিশ মুঘল বা তুর্কো-আফগান যুগের স্থাপত্যের সঙ্গে দেশজ শৈলীর মিশ্রণ। আমাদের বাংলাভাষায় কত আরবিক ও ফার্সি শব্দ আমরা রোজ ব্যবহার করি—আদালত, উকীল, খারিজ এরূপ আরো কত। সমন্বয়বাদ আমাদের মজ্জায় আমাদের মস্তিষ্কে।

একথা ঠিক যে জাতীয় আন্দোলনের স্রোত ধারায় আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ (মূলত কংগ্রেস, বিশেষ করে জহরলাল নেহেরু) জাতপাত, ধর্মীয় ও বর্ণগত সংকীর্ণতার উর্দ্ধে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন, তৎকালীন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার কারণে। স্বাধীনতার দোরগোড়ায়, ১৯৪৬-৪৯ -এর কাল পর্বে যখন গণপরিষদে সংবিধান রচনার তোড়জোড় চলছে মূলত কংগ্রেসের নেতৃত্বে, তখন কোন কোন সদস্য সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে যুক্ত করতে চাইলেও তা কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। সে বিতর্কে যাব না—ওটা অন্য প্রসঙ্গ। আমরা এখন দেখি আমাদের সংবিধান কি বলে।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী প্রবর্তিত সংবিধানের কোথাও কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষা' শব্দটির উল্লেখ নেই। ১৯৭৬ সালে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি সংবিধানের প্রস্তাবনায় যুক্ত করা হয় রাজনৈতিক কারণে। ১৯৫৫ সালে আভাদি কংগ্রেসে নেহেরু 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ' গঠনের অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁর কংগ্রেস দল, তাঁর কন্যা ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে সেই 'রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করে ব্যাংক, বীমা ও ভারী শিল্পের রাষ্ট্রায়াত্ব করণের মাধ্যমে। এখানে 'সমাজতন্ত্র'-এর অনুসঙ্গ হিসাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে প্রস্তাবনার অঙ্গীভূত করা হয়।

অথচ মূল সংবিধানে (১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী প্রবর্তিত) 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটির ব্যবহার নেই। তৃতীয় অধ্যায়ে যে সব অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে তার মধ্যে নাগরিক-অনাগরিক নির্দিশেষে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃত হয়েছে ২৫ থেকে ২৮নং ধরায়। ২৫ নং ধরায় সকল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্যের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে এদেশে সকল ব্যক্তি নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী ধর্মমত পোষণ, ধর্মানুশীলন ও ধর্মপ্রচার করার অধিকারী। ২৬ নং ধরায় ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অধিকার স্বীকৃতি। কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার কোন অংশ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে সেই ধর্মের রীতি মেনে। আবার ধর্মাচারণের উদ্দেশ্যে সম্প্রদায় ও তার অংশগুলি সম্পত্তি অর্জন, ভোগদখল এবং তা বিক্রয় বা দান করার অধিকারী। অবশ্য এক্ষেত্রেও জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধি মেনে চলতে হবে। ২৭ নং ধরায় ধর্মের নামে কর আরোপ বা অর্থদণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সর্বশেষে ২৮ নং ধারায় সরকারী অর্থানুকূল্যে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা দান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে সরকারী অর্থানুকূল্যে পরিচালিত কোন ধর্মীয় ট্রাস্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর কিম্বা, শিক্ষার্থী নাবালক হলে, তার অভিভাবকের সম্মতি অনুসারে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে। অবশ্য পুরোপুরি ধর্মশিক্ষা দানের জন্য গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দান নিষিদ্ধ নয়।

তবে মনে রাখা উচিত, ২৫ নং এবং ২৬ নং ধরায় বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর 'রাষ্ট্র' প্রয়োজনে বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারে। ২৫(২) ধরায় টাকাকড়ি সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলীর জন্য রাষ্ট্র ২৫ ধারায় বর্ণিত অধিকারটিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এছাড়া সামাজিক কল্যান ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র হিন্দু মন্দিরে সকল শ্রেণির হিন্দুর প্রবেশাধিকার নিশ্চিৎ করতে পারে। ২৬ নং ধরায় বর্ণিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকারের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ স্বীকৃত। আমরা জানি ভারতীয় রাষ্ট্র আইনগতভাবে কোন ধর্মকে প্রোমোট করে না। তবে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব ও সহাবস্থানকে মেনে নেয়। কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োজনে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপও করতে পারে। আদালতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ

বিশ্লেষণ করে ধর্মীয় আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি এবং সীমারেখা নির্ধারণ করার (তাহের বনাব তায়েব ভাই মামলা)।

আমাদের পরিসর অল্প। তাই আলোচনা দীর্ঘায়িত করা যাবে না। শুধু বলি, সংবিধানে কোথাও রাষ্ট্রকে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন থাকতেও বলা হয়নি। কারণ বলার প্রয়োজন হয়নি। সর্বধর্ম সহিষ্ণুতার নীতি এদেশে আবহমান কালের। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে পুঁজি করে রাজনীতির কারবারীরা ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করেন। এক গোষ্ঠী কোয়ালিফায়েড সেকুলারিজমের কথা বলে সংখ্যাগরিষ্ঠাতাবাদ বা Mejoritarianism প্রচার করতে চায়। অপরগোষ্ঠী সেকুলারিজম-এর সাহায্যে তাদের সমর্থনের ভিত্তি প্রসারিত করতে চায়।

সর্বধর্মের সহাবস্থান, সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে ঐতিহ্য কবীর, রামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য কিম্বা রামমোহন, মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরা আমাদের দিয়ে গেছেন তারই ধরাস্নানে সিঞ্চিত ভারতীয় সমাজ। কি ধরনের পারিভাষা আমরা ব্যবহার করব এই আদর্শকে তুলে ধরতে—সেকুলারিজম না সিনক্রেটিজম—তা নিতান্তই গৌণ।

বিপ্লব আসুক

কুন্তল ধাড়া *(সেমেস্টার সিক্স, ইংরেজি অনার্স)*

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

একটি কালো লোডশেডিং যখন চোখে ধাঁধা লাগায়,
বোঝা যায় যে রাজ্যে রোম্যান্টিসিজম বাকি নেই কিচ্ছু
ফাঁকা ছাদের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত....
শুধুই হিংসা আর ভয়ের ইতিহাস ছড়ানো ছিটানো।
মাথার ওপর দিয়ে কয়েক ডজন বিমান উড়ে যায়
রাতজাগা হট্টিটি পাখির মতো শব্দ ক'রে মুখে
মৎস্যচক্ষু-ন্যায় স্থির, অন্ধকার নারকেল পাতার বিনুনিতে
তুমি হাতড়ে বেড়াও হারানো সংস্কৃতি আর সৌজন্যতা
আমার ঘরের ডানদিকে কৃত্রিম আলোর কলতান
বামদিকে না খেতে পাওয়া হতাশ পারিবারিক কলহ

তবে ইতিহাস নাকি নিজেকে ফিরিয়ে আনে বারবার
এই ভিখারির দেশে নাকি আবার ফুটবে শিউলি।
ধ্রুবতারাটা এখনো অচঞ্চল কালো টাকার বস্তিতে।
তবু যদি আরো কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হয়,
তুমি আমি মিলে স্বপ্ন দেখে যাব রক্তিম সেই সকালের।
একটা দুর্নীতিভেজা লোডশেডিং-ই বিপ্লব গড়ে দেবে
আঙ্গুল দিয়ে প্রমাণ করে দেবে ধাপ্পাবাজির উপপাদ্য
আমি লড়ছি, রক্ত দিয়ে সাহস দেখিয়ে তুমিও সামিল হলে
বিপ্লব এসে ধুয়ে দেবে আর্তনাদের মরুভূমি, আর,
জেনো, ধ্বংস হয়েও হাজারবার নষ্ট হয়নি যৌবন।

রবিস্পর্শে মোড়া জোড়াসাঁকো

তনু মজুমদার *(সেমেস্টার সিক্স, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ)*

****

গান, কবিতার সুর ছন্দে মন চেয়েছে এ কবিহৃদয় ছুঁতে
সঞ্চয়িতার পাতায় পাতায় চেয়েছি তোমায় আপন করে পেতে।।
কিন্তু তোমার অনন্ত হৃদয়, সীমাহীন বিস্তার।
আমার হাতের ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য সেথা খুঁজে পায়নিকো পার।
তাই তোমার স্পর্শ, কাটানো স্মৃতির নবস্বাদ আস্বাদনে।
চলে গেলাম সেই স্বপ্নপুরী জোড়াসাঁকো ভবনে।
রবীন্দ্রসংগীতের মৃদু সুরের দোলায়, সারা মহল পরিস্নাত।
গাছপালারা সুরের ধ্বনিতে নাচছে অবিরত।
সোনার তরী, ঠাকুরদালান, রবীন্দ্রমঞ্চ আর অন্দরমহলের শোভা
তোমার স্পর্শ পেয়ে তারা ছড়াচ্ছে আনন্দ-আভাব।
লাল কালো ওই সারাশিঘেরা তোমার দোতলার ওই ঘরে।
শীতলপাটি বিছিয়ে তোমার ছড়া লেখার কথা মনে পড়ে।
তোমার সেই পোশাক, জোব্বা আর দোয়াত কলমেতে।
পা থমকালো তোমার ছবির ওই চোখের পলকেতে।
যেথায় ভরা ছিল কত ছন্দ, সুরের অশেষ ভাণ্ডার।
যা উজাড় করেছো স্কলের তরে, যা ছিল সুখ-দুঃখ তোমার।
অন্দরমহলে ঘরের ভিতর ঘরের গোলকধাঁধায় পড়েছি যখন।
তোমার সেইসব অমূল্য চিঠি, আঁকা, লেখায় আটকেছে এ মন।
অবশেষে জোড়াসাঁকোর প্রতিটি স্পন্দে স্পন্দে মেতে।
এ ক্ষুদ্র হৃদয় শুধুই চায়, হারিয়ে যেতে তোমাতে।

The churn

Jayita Ghoshal Roy
(Assistant Professor, Anthropology)

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Get Churned—as you weave your life through myriad mazes,
It’s only natural;
Natural as far as mythology goes
Only churning yields what you vie for
For that you have fought tooth and nail
The victor and the vanquished.
The rhythmic churn
Will radiate non harmonic waves-
For the perceptors did not cohese;
As the chaotic turbulence subsides
Serenity reigns
Serendipity sets in

শিরোনামহীন

কুন্তল কোলে *(সেমেস্টার সিক্স, উদ্ভিদ বিভাগ)*

শিরোনামহীন-১

যে মুখগুলো কখনো তুমি ভালোবেসেছিলে
সেই মেয়েটি যে বাঁচিয়েছিল তোমায়
ঈশ্বরের চোখের ভিতর
তারা ইচ্ছাশক্তির পালকে ঢেকে গেছে
আমি স্পষ্ট তাদের গোঙানি শুনেছি
থাবার দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে থেকে
তারা ক্লান্ত।

শিরোনামহীন-২

হে দ্বিখণ্ডিত মধ্যরাত
তরমুজের লালটুকু আমায় দাও
শ্মশানের ছাই আমায় খুঁজছে।

নিস্তব্ধতার বাস্তব

দেবস্মিতা ভট্টাচার্য্য *(সেমেস্টার ফাইভ, ইংরেজি অনার্স)*

****

হঠাৎ এক মুহুর্মুহু ঝংকার ধ্বনি
আমার মিথ্যে সুখের কথায় ভিজেছে তার সুখ,
হাওয়ার দাপট
শুধু স্তব্ধতায়;

টেবিলের কিনারায় রয়ে যাওয়া
অ্যাকোরিয়ামটা এখন মাটিতে!
গোল্ডফিশটা ছটফটাচ্ছে খুব
হয়তো প্রাণের দায়েই;

আমি নীরব দর্শকমাত্র;
হাঁটা চলার ক্ষমতা নেই
নেই কোনো বাস্তবতার ধারণা
নেই কোনো এক স্থায়ী জীবন
নেই কোনো উচ্ছ্বাস
নেই কোনো উৎসবে যাওয়ার অধিকারপত্র;

আমি, সেই আমি
যে বাস করে অবাস্তবতার অনুকূল পরিবেশে,
দূরে বহুদূরে
এক কল্পনার জগতে,
যেখানে আমার হাত দুখানি আর পাশে
টেবিলে রাখা রং তুলিগুলোই আমার পরম বন্ধু।

ও আর ওই
সামনে থাকা আমার এই সাদা কালো
গোলাপি, বেগুনি ক্যানভাস,
একঘেয়ে এই সাদা কালো জীবনটার রঙিন সম্পদ।
এরা আমার বন্ধু,
তবে আমার আরোও এক
পরম বন্ধু আছে
যাতে আমি শান্তি খুঁজে পাই।

ছোট থেকেই যে জীবনে চলতে শিখিয়েছে,
বারবার পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও যে
সঙ্গ ছাড়েনি কোনদিন
এ সেই...
এই চারটে চাকার চেয়ারখানি,
এটাই আমার চলাফেরার একমাত্র অবলম্বন।

দিন হোক বা রাত, ভোর হয়তো বা সন্ধ্যে
হয়তো বা সেই দিনটা, এই আমার বড় অবলম্বন।
ওইযে কাপড়ের কোণটা এখনো আটকে রয়েছে,
বাঁহাতখানা পৌঁছোতে পারছে না ঠিক,
তবুও আজকে আমি বাঁচবো,
বাঁচাবই!

বড় দুটো চাকায় একটু জোরে চাপ,
আর ছোট চাকা দুটির ওপর
পায়ের নির্দেশনা,
কাপড়টা একটু ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ পেলাম;

তবে আজ যেন লক্ষ্যভেদ এর
আকর্ষণটা এটু বেশিই গাঢ়,
কই সেদিন তো অনুভব করিনি,
এতো টান, এতো আকর্ষণ?

প্রথম চিনেছিলাম তোমায় ঐ মঞ্চ-কাঁপানো দর্শক-ফাটানো দৃপ্ত দৃঢ় কণ্ঠ দরুণ,
বিশ্বাস করতে পারিনি সেদিন ভেবেছিলাম ইন্দ্রিয়গুলোর কর্মকান্ড বোধ হয় শেষের পথে;
তুমিই বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলে আমাদের জীবনটাও ঠুনকো নয়,
সেরা দ্বিতীয় বাঙালি চিত্রশিল্পীর জীবনের পথপ্রদর্শক হয়েছিলে তুমি,
সেই আমাদের পথচলা, অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলে,
চিনিয়ে দিয়েছিলে অনেকখানি বাস্তব।

তবে বাস্তবের রূপায়ণ আমি
সঠিকভাবে করতে পারিনি সেদিন;
অবাস্তবতার তুলির টানে,
পরিণয়ের চিত্রায়ন করে ফেলেছিলাম

আমার কালো ক্যানভাসে
তোমার সাদা তুলির টানে।

তবে আমি তৃপ্ত
তোমার শুভ পরিণয়ের চিত্রায়ন বেশ পছন্দ হয়েছিল তোমাদের।
তবে তা কি ছিল তাহলে?
এর উত্তরেই পেয়েছিলাম বাকি জীবন বেঁচে থাকার রসদ-বাস্তবতা।

পুরোপুরি ভাবে বুঝেছিলাম,
তুমি ছিলে চলতি পথের পন্থী,
আর আমি সেই হাওয়ায়
ভেসে যাওয়া এক নয়-অসম্পূর্ণা।

আকর্ষণ ছিল না তাই,
ছিল একরাশ শ্রদ্ধা।
আর ভালোবাসা?
সেতো আছে বটেই!
নইলে এখনো কোন সুবাদে,
আমার প্রত্যেক প্রার্থনায় তোমাদের ভালো থাকা খুঁজে পাই?

গোল্ডফিশটা এখন ঐ সাদা ট্রান্সপারেন্ট বোতলটির
নব-নির্বাচিত, নির্মানিত বন্ধুখানির সঙ্গ দিচ্ছে টেবিলটার উপর,
নতুন পরিবেশ, নতুন জায়গা
মানিয়ে নিচ্ছে ঠিক।
আর আমি আর্দ্র-সিক্ত
কাচপাল্লার পাশে আধবসা অবস্থায়।

নিস্তব্ধতা আজ আমার দারুণ বন্ধু
দূরে ঐ নিবিড় তিমিরে বাজছে সেই তীব্র অথচ ম্লান ঘণ্টাধ্বনি,
তুমি যে পথ আমায় চিনিয়েছিলে,
তার প্রমাণ দাখিলে আমার কক্ষের প্রতিটি প্রাচীর আজ প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী;

যত বেদনা, যত হতাশা, যত অভিমান সব মিশে গেছে আঁধারে,
অন্ধকারে হারিয়েছি অনেক...
হারিয়ে গেছে তোমায় চেনানো সেসব পথ,
হারিয়ে দিয়েছে আমার সেই পুরনো দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া আমিটাকে;

আমি এখন নতুন আলোর দিশারি
চিনতে শিখেছি নির্ভুল রাজপথ, গলিপথ, এমনকি কানাগলিও;
একটা গাড়ি এসে থামল
৩ নং, ৮১/২ দয়াল ব্যানার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ঠিকানায়,
জন্মদিনের উপহারে বিদেশজয়ী
সারাবিশ্ব প্রতিযোগিতার আমার সেরা সম্মান-আজ তোমার।

আমি আজ জিতেছি
নতুন আমিকে, জিতেছি
অন্ধকারকে নতুন করে, জিতেছি
আর্ণ্ডোলার বন্ধু হতে পেরে, জিতেছি
হুইলচেয়ার সাথে, খাটো হাতেও আকাশ ছুঁতে পেরে জিতেছি
অপূর্ণতা দিয়ে পূর্ণতা প্রমাণ করতে পেরে জিতেছি
প্রত্যেক জয়ে তোমায় অনুভব করতে পেরে জিতেছি,
নিস্তব্ধতার মধ্যেও বাস্তব খুঁজে পেয়ে আমি জিতেছি!
জিতে গেছ তুমি,
আজ আমি জয়ী।

Flight of Fancy

Tiyasha Golui
(Semester V, English Honours)

What would be happen, if all our imagination become real?
All our thinking thoughts, desire all get success.
The utopian world-where all over happiness and peace would be existed.
A world, where no war, no fear, no malice would take place,
Only happiness, peace, merriment will acquire the whole space.
Can you imagine a world without discrimination, complexities?
Where all systems are controlled in equal order.
The world may be in all our mind,
In a subdued manner.
Our imaginary world is not yet beyond our reach!
When all people will recognize their humanity by themselves,
May be we can touch the world of our imagination.

ক্ষয়িত চাওয়া

তিয়াসা সেনাপতি *(সেমেস্টার সিক্স, ইংরেজি অনার্স)*

****

এক বিকেলে, রঙিন প্রাচী
অনুদ্ধত হাওয়াকল,
তোমার কাছে চাইলাম তাই—
অপেক্ষা আর সেই জোনাকি!

কোন জোনাকি? সেই জোনাকি?
যেই জোনাকির তীব্র সবুজ ধুঁকছে তখন ভোরের শেষে!
ওসব ফেলে চাইলাম তাই,
সাদা রঞ্জন, শান্ত নদী!

শান্ত নদীর এক পাড়েতে, চুপটি করে,
দুজন বসে দেখছিলাম সেই নৌকো ডিঙি,
তুমি বললে, ‘আর কী নেবে?’
আর? আর .... সাদায় কালোয় একটা ছবি!

সেই ছবিটা থাকবে আমার আকাশ রঙের হ্যান্ডব্যাগেতে,
না, না, থাকবে তোমার উপন্যাসের সেই পাতাতে,
কোন পাতাতে? যেই পাতাতে ভেবেছিলাম—
আমার নায়িকা, তোমার কবি!

লিখলে বটে উপন্যাস,
নায়িকা হলো অভিমান!
আমি তখন কোন বনেতে?
ওলট-পালট করছি সব-ই!

এদিক-ওদিক, উথাল-পাথাল,
আমার মনের নৌকোডুবি!

বাড়িটা ছিল নিকষ কালো

অভীক দাস *(সেমেস্টার সিক্স, ইংরেজি অনার্স)*

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

বাড়িটা ছিল নিকষ কালো
বাইরে থেকে দেখা যায়,
ফুটপাথেতে থমকে গিয়ে
ধুকপুকানি পথ আটকায়।
রাস্তায় তবু আলো আছে,
ল্যাম্পপোস্টের নিচের ছায়ায়
দাঁড়িয়ে যেন ওই কে আছে,
হারানো তার হাজার স্মৃতি
আবার যেন পথ দেখায়।
বাড়ি লাগোয়া রাস্তা আঁধার
পথ চলা আজ হচ্ছে দায়;
কিন্তু তাকে খুঁজতে হলে
এটুকু বিপদ এড়ানো যায়।
বাড়িটা ছিলো দেখতে পোড়ো
ভিতরে কী আজ কে জানে,
জানালা-দরজা নেই বাড়িটার
সেটা যে এই মনও মানে।
বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে
দেখছি ভাঙা ফার্নিচার,
পূর্ণিমা চাঁদ দিচ্ছে আলো
তাতেই খুঁজব যাকে খোঁজার।
হালকা আলো, হালকা আঁধার,
পরিবেশটা ভূত্‌তুড়ে;
তবু বিরহের বেদনা যেন
খাচ্ছে যে কুড়েকুড়ে।
ডাইনে গিয়ে কাঠের সিড়ি;
উই ধরেছে পুরোনা কাঠে,
চারদিকেতে নোংরা বড়ো
ময়লা জমে মাঠে-ঘাটে।
সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে
কাঠ ধরেছে নিজের গীত,
অন্ধকার ঘনায় মনে
কোণে এক অচেনা শীত।
সিঁড়ির শেষে যাচ্ছে দেখা
চেনা এক আলোর রেখা,
ছুটতে গিয়ে তাড়াতাড়ি
লেগ ফ্রাকচার দেয় ব্যথা
আলোর উৎস গেল পাওয়া
সঙ্গে সেই মানুষটাকে,
নোংরা মেঝেয় নগ্ন হয়ে
করেছে স্নান আলতাতে।
উপুড় দেহ সোজা করতে
রইল না বাকি বুঝতে আর;
কান্নাতে হলাম মত্ত,
যে করেছে একাজ
তার আর যাই-থাক
নেই পুরুষত্ব!

ছড়া

অপেক্ষা

অভীক দত্ত *(সেমেস্টার ফোর, বাংলা বিভাগ)*

****

গরম কালের দুপুর বেলা,
সূর্য খেলছে রোদের খেলা।
একমাত্র গাছের ছায়া,
করছে শীতল সকল কায়া।
বলছে সবাই দ্রুত হেথায়,
বৃষ্টি নামবে এবার বোধহয়।
জীবন কেমন থমকে গেছে,
রৌদ্র তপ্ত হাওয়ার নাচে।
মিষ্টি মধুর শীতল হাওয়া,
মেঘলা আকাশ বাড়ায় মায়া।
সবাই এবার অপেক্ষাতে,
বৃষ্টি নামবে সে কোন রাতে।

বৃষ্টি বিকেল

অয়ন বর *(সেমেস্টার চতুর্থ, বাংলা বিভাগ)*

****

মেঘরাশি আসছে ধেয়ে,
সূর্য কিরণ যাচ্ছে ছেয়ে।
বইছে যখন শীতল হাওয়া,
হচ্ছে ঘন কালো ছায়া
আসবে এবার বৃষ্টি প্রবল,
নদী নালায় উপছাবে জল
মাছেরা সব করবে খেলা
বৃষ্টিমুখর বিকেল বেলা।
গাছেরা সব করবে স্নান,
গাইবে তাদের সুখের গান।

স্বপ্নভঙ্গ

মিঠুন হাজরা *(শিক্ষা সহায়ক)*

****

রোজ সকালে ঘুম ভাঙে যার,
দু'চোখ ভরা স্বপ্ন মেখে।
ক্রোধের আগুন জ্বলছে যে তার,
ভূলুণ্ঠিত স্বপ্ন দেখে।
ভাতের জন্য করব দ্বন্দ্ব,
জাতির দ্বন্দ্ব করব বন্ধ।
অনাহারে আজ রইবোনা মোরা,
সইবোনা আর শত মন্দ।

মূর্খ আমি, মূর্খ তুমি, মূর্খ আমার সমাজ।
যেমন বোঝায়, তেমন বোঝো, হায়রে! যুবসমাজ!
লড়তে হবে, মরতে হবে, গর্জে তোমায় উঠতে হবে।
মলিনতা গ্রাস করেছে, হায়রে যুবসমাজ!

রক্তবিন্দু চায় যে পেতে,
ঝিনুকবিনা মুক্তোটাকে।
সিক্ত হলো এই ধরণী
শ্রমবিনা সাফল্যতে।
যোগ্যতা আজ পদদলিত, অবহেলিত,
অরাজকতার কাছে।
মনুষ্যত্ব হ্রাস পেয়েছে, বেকারত্বের মাঝে।

জীবন মানে লড়াই করে, বেঁচে থাকা নয়,
জীবন মানে জীবন কেড়ে, ভালো থাকা নয়।
পরাধীনতার গ্লানিতে আজ যুব সমাজ বাকরুদ্ধ,
স্বাধীন দেশেতেও আজ, স্বাধীনতার যুদ্ধ।

স্মৃতির সরণি বেয়ে

সায়ন হাইত *(সেমেস্টার ফোর, রসায়ন স্নাতক)*

****

ফিকে আলো, ক্লান্ত বিকেল, আকাশ করছে কালো;
খেলা ছাড়ো, সময় হয়েছে এবার তো ঘরে চলো!
ঢুলুঢুলু চোখে পড়ছি যখন, মার বকুনি খেয়েছি কত;
বাবা এলে রেহাই পাবো, একসাথে খেয়েছি শত!
স্কুল মানে আনন্দ তখন, বন্ধুরা মানে প্রাণের ভাই।
স্কুলফেরত মস্তানগুলো বলছি তখন, কবে হব বড়ো
সবাই!
আজও ফিকে হয় আলো, ক্লান্ত হয় বিকেল, আকাশও
করে কালো;
খেলে না শুধু তারা, জীবন যাদের ছিল বেশ
ভালো;
ভাইগুলো আছে আজও, ফেসবুক লাইক-এ!
স্কুলবাড়ির গন্ধটা আজ ডাক দিয়ে বলে, কিরে
ভালো আছিস তো তোরা সকলে?

Creative Blockage

Srimoyee Maiti
(Semester IV, English PG)

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Well everyday I ageing
Mine brain cells self-sabotaging.
This is idiosyncrasy,
An absolute lunacy.
What an evil toss....
Nothing more to loss,
Nothing more to gain.
A brainless brain....!
Is a pathetic pain.
At times ideas are hard to find;
What an empty useless mind.
Right now I am in utter shock,
Oh no! Is this my creative block...?
My imaginations all lock! Locked! Locked!
For the magazine I just want to write,
This seems like an absurd fight.
Theyself mocking at thy own plight.
This is bizarre, this is not right.
The brain's battling with all might!
Ironically stupid, comically shocking
At my own self I am mocking.
Is this funny?
Or simply irony?
I'm not giving up, nor bending!
This is what I am sending
Here is the peom's ending.

মানুষের ছায়া, ছায়ার মানুষ

রক্তিম ভট্টাচার্য *(সেমেস্টার ফোর, ইংরেজি বিভাগ)*

****

আমি বাথরুমে আটকে গেছি। ছিটকিনিতে অ্যালার্জি আছে, তাই দরজা খোলা রেখেই প্রাতঃকৃত্য সারতে ঢুকি। বাড়িতে আমি একাই, ফলত অসুবিধা হয় না কখনোই। কিন্তু আজ হল। দরজাটা ভেজিয়েই রেখেছিলাম, খুলতে গিয়ে দেখি, একেবারে সেঁটে গেছে। টানাটানি করলাম, ধাক্কাধাক্কি করলাম। কোনো লাভ হল না। নিরুত্তাপ, নিস্প্রাণ দরজা একেবারে জগদ্দল পাথরের মতো আবেগহীনভাবে আটকে রইল।

দরজার বাইরে একটা ছিটকিনি আছে। সেটা কি আটকে গেল কোনোভাবে? তাই বা কী করে সম্ভব। ভৌতিক ব্যাপার নাকি? অন্তত গত পঞ্চাশ বছরে কোনো ভূতের দেখা, বা অনুভব আমি পাইনি। তাহলে কে? কে আটকে দিল আমায়? ছায়াটাকে একবার দেখেছিলাম বটে ঢোকার আগে, সে-ই কি বিশ্বাসঘাতকতা করল? ব্যাটা ভারী বজ্জাত, আলোতে থাকেন, দেখান ভারী ভালো। আদতে বদমাইশের একশেষ।

হঠাৎ বাইরে কার যেন গলার আওয়াজ শোনা গেল। ভালো করে শুনে বুঝতে পারলাম, এ-তো আমারই ছায়ার গলা! কী পাজি! আমাকে আটকে রেখে বেয়াদপি করে এখন সুর ভাঁজছে! এইজন্য বলে সবসময় নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করতে নেই। অবশ্য 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা না থাকলে 'বিশ্বাসঘাতকতা' ব্যাপারটাও অস্তিত্ব সংকটে পড়ে।

"কী ব্যাপার, ঠ্যালাঠেলি করছেন কেন? একটু গান গাইতে দেবেন না শান্তিতে?"

কী সাহস! আমাকে আটকে রেখে আমাকেই তড়পানি! দেখাচ্ছি মজা। কিন্তু এখন আমাকে বেরোতে হবে। তাই রাগ চেপে বললাম, "তোমার ব্যাপারটা কী হে? আমাকে আটকে রেখেছ কেন?"

"আহা, সবসময় বাইরে থাকবেন কেন? একটু ভেতরেও থাকুন। দেখুন, নিজেকে কেমন লাগে।"

"শয়তানি হচ্ছে? এই যে আমাকে আটকে রেখেছ, এর কী শাস্তি হতে পারে জানো? চেনো আমাকে, আমি কে?"

"অপনি নিজে চেনেন নিজেকে?"

গোলমেলে প্রশ্ন। বললাম, "তো আমাকে আমি চিনব না তো কে চিনবে?"

"কই? আমাকে চিনতে পারলেন না তো। আমি তো আপনারই অংশ।"

থমকালাম। ছায়ারা একটু দুষ্টুমি করে জানি, কিন্তু লাই পেয়ে বাড়াবাড়ি করছে এবার।

"তুমি আগে বলো, আমাকে এভাবে আটকে রাখার কারণ কী?"

মিনিটখানেক চুপ, তারপর নিস্পৃহ উত্তর, "ওই যে, আপনাকে একটু চেনার সুযোগ করে দিলাম।"

"কাকে?"

"নিজেকে।"

"উফ, কী হেঁয়ালি হচ্ছে এসব? তাড়াতাড়ি দরজা খোলো, আমি বেরোব।"

"আহা দাঁড়ান না। অত তাড়া দিচ্ছেন কেন বলুন তো?"

"তো, এখানে একটা দমবন্ধকর পরিবেশে কেউ থাকতে পারে কি? আমার কষ্ট হচ্ছে।"

"সে তো আমারও হয়, ছাড়েন না তো!"

"মানে?"

"মানে, এই যে আমাকে আপনি আপনার সঙ্গে আটকে রাখেন সবসময়, আমার কষ্ট হয় না?"

"যাহ বাবা, সে তো তুমি নিজের ইচ্ছেতেই থাকো। তাছাড়া বাইরেই তো ঘোরো, দুনিয়া দেখতে পাও। আর অন্ধকারে যখন থাকি, তখন কি তোমায় ধরে রাখি?"

"সে-তো নিছক আমি আপনার অপকর্মে থাকতে চাই না বলে। মানুষ খচ্চর, ছায়ারা আদর্শবান।"

"ইয়ার্কি হচ্ছে? আমি বাদে তোমার কি অস্তিত্ব আছে হে? শরীর ছাড়া তুমি কে?"

"আহ, খালি শরীর আর শরীর। তোমার কি মন নাই কুসুম?"

"এই শোনো, খামোখা আমাকে আটকে রেখে ফালতু বকে মাথা খাচ্ছো, আবার এখন মানিক বাঁড়ুজ্জ্যে ঝাড়ছ। তোমার কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।"

"সে আপনার সঙ্গে থেকে থেকে কোন্ দিনই বা ভালো হয়েছে আমার? ধুর ধুর, কত শখ ছিল, দুনিয়া দেখব, সবার মতো আনন্দ করব। তা নয়, আপনার সঙ্গে লেপটে লেপটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমারও তো প্রেম করতে ইচ্ছে হয় বলুন।"

"প্রেম? ছায়ার আবার প্রেমিকা! হাসালে!"

"কেন? ছায়াদের প্রেমিকা থাকতে নেই?"

"না, নেই, প্রেমিকার শরীর লাগে, শুধু মনে কাজ চলে না।"

"তাই নাকি? ক'টা ছায়ার প্রেমিকা চেনেন আপনি? ক'টা দুনিয়া ঘুরেছেন?"

"ক'টা আবার দুনিয়া? দুনিয়া তো একটাই। সে আমি অনেক ঘুরেছি।"

"কিস্যু জানেন না। অনেক দুনিয়া আছে। বাইরের দুনিয়া, ভেতরের দুনিয়া, আমার দুনিয়া, আপনার দুনিয়া, আপনার আপনার দুনিয়া....."

"আরে ধুত্তেরিছাই। মানুষ সাধারণভাবে যে দুনিয়া বোঝে, সেটাই আসল দুনিয়া।"

"বাব্বাহ, আপনি আসল-নকল এত সহজে জেনে গেলেন? যাক গে, সে আপনার 'আসল' দুনিয়াও অপনি ঠিক করে ঘোরেননি।"

"যত ফাজলামি। আমি বহুবার দুনিয়া ঘুরে ফেলেছি।"

"ছাতার মাথা ঘুরেছেন। বলুন তো, ধর্মের কল কীসে নড়ে?"

"ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এটা একটা প্রবাদ। সবাই জানে।"

"ছাই। ও আগে নড়ত। যেদিন মানুষ জঞ্জালের বাড়ি ছেড়ে বাড়ির জঞ্জালে ঢুকেছে, সেদিন ধর্মের কল ভোটের হাওয়ায় নড়ে।"

"কী জ্ঞান! তা, হাওয়া আর বাতাস কি আলাদা?"

"অবশ্যই। হাওয়া হল তাৎক্ষণিক, বাতাস চিরকালীন।"

"তা তুমি কোনটা ভালোবাসো? হাওয়া না বাতাস?"

"অবশ্যই বাতাস। গায়ে লাগাই, পোহাই, মেখে নিই। হাওয়ায় যারা একূল-ওকূল ঢলে পড়ে, তাদের দলে আমি নেই।"

"এই এই, তোমার সঙ্গে এত কথা আমি কেন বলছি? তুমি আমায় খুলবে কি না?"

"খুলব খুলব। আপনাকে আটকে রেখে আমার আর কী লাভ বলুন। তবে এখন না, আরো কিছুক্ষণ পর। একটা ঘটনা ঘটবে, তারপর।"

"ঘটনা ঘটবে? কী ঘটনা?"

"পৃথিবী ধ্বংস হবে। ওই যে, শুনতে পাচ্ছেন?"

"অ্যাঁ, সে কী! কী হচ্ছে বাইরে এসব?"

"প্রলয় আসছে। এরপর জল আসবে, আগুন আসবে, মাটি আসবে, বাতাস আসবে। তারপর সব ছায়ারা আসবে।"

"এত সবের পর ছায়ারা বেঁচে থাকবে?"

"থাকবেই তো। ছায়াদের তো মৃত্যু নেই। আপনারা মরবেন, তারপর নতুন মানুষ আসবে, ছায়ারা আবার শরীর খুঁজে নেবে।"

"এই এই, আমাকে বের করো, আমার ভীষণ ভয় করছে।"

"হা হা, এই তো বলছিলেন, খুলে দাও। এবার বলছেন বের করো। ছিলাম চাকর, হয়ে গেলাম রাষ্ট্র। ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। কী ক্ষমতা বলুন!"

"তুমি আমাকে বের করো ভাই, অনুরোধ করছি। যা চাইবে, তাই দেব।"

"উফফ, রাষ্ট্র মানেই ঘুষ দেওয়া যায় না রে বাবা, কবে যে এসব ছেলেমানুষি আপনাদের যাবে কে জানে!"

"তাহলে কীভাবে বেরোব আমি?"

"সময় হলেই বেরোতে পারবেন। এখন আসি, টাটা।"

"এই এই, দাঁড়াও, আরো এই ..."

গর্জন। উল্লাস। কান্না। চিৎকার। আগুন। ধোঁয়া।

"আমাকে বের করো, বের করো আমায়..."

হাহাকার। বজ্রপাত। মহামারি। যুদ্ধ। অন্ধকার।

“হেল্প, প্লিজ হেল্প মি। তুমি কোথায়?”

তোলপাড়। ধ্বংস। চুরমার। বর্ষণ।

“আমায় কেউ বাঁচাও...”

ঘূর্ণিঝড়। লণ্ডভণ্ড। চূর্ণ।

“আমি নেই....আমি শেষ....”

ক্ষয়। মহাকাল।

“আমি বেঁচে আছি?”

চুপ।

“আমি কে?”

তারপর আবার গাছেরা মাথা তুলে দাঁড়াল। মরুভূমিরা দয়াপরবশ হয়ে সমুদ্রকে জায়গা ছেড়ে দিল কিছুটা। গুহা কাছে টেনে নিল আগামীর অভিশপ্তদের।

খুলে গেল ছিটকিনি। বেরিয়ে এলাম বাথরুম থেকে।

এখন সামনে হাজার হাজার বাথরুম। হাজার হাজার ‘আমি’ বসে আছি ভেতরে। সবক’টার দরজা বন্ধ। সবক’টায় গোমরাচ্ছি আমি। সবক’টায় পচছি আমি। আমি সবাইকে চিনি, অথবা কাউকেই চিনি না। মনটা ভীষণ রকম ভারী, অথবা সাংঘাতিক রকমের হালকা লাগছে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ধাক্কাধাক্কির আওয়াজ আসছে ভেতর থেকে। দরজার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গুনগুন করতে লাগলাম। তারপর ধাক্কার আওয়াজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে বললাম, “কী ব্যাপার, ঠ্যালাঠেলি করছেন কেন? একটু গান গাইতে দেবেন না শান্তিতে?”

আন্দোলন

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় *(অধ্যক্ষা)*

****

দরজাটা খোলার আওয়াজ পেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এল ফটিক। মেয়েটা এলো বোধহয় কলেজ থেকে।

"কিরে মা, দেখা হল তোর ম্যাডামের সাথে?"

বাবার সামনে মুখ নিচু করে দাঁড়াল মলি।

"না বাবা, দাদারা বলল আজকেও উনি আসেননি।"

"সেকি রে! কবে আসবেন কিছু জানতে পারলি? পরীক্ষার টাকাটা জামা করতে না পারলে তো মুশকিল কিন্তু এতগুলো টাকা কি করে যে যোগাড় করি! ম্যাডামের সাথে কথা বলে একটু যদি কিছু কম-সম করা যেতো!"

বাবার অসহায় মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না মলি। টানা কতদিন ঘরে বসে রয়েছে বাবা। যে দোকানে খাতা লিখত, দোকানের মালিক বলেছে এখন বাজার খারাপ কর্মচারী রাখা সম্ভব নয়। বহুদিনের বিশ্বস্ত কর্মচারী বলে দু-একটা খুচরো কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বাবার সহৃদয় মালিক। তা দিয়ে কোনরকমে দিন গুজরান হয়ে যাচ্ছে বটে। কিন্তু সংসারে চারটে পেট, দু'বোনের পড়াশোনা, অসুখ-বিসুখ, লোক সমাজ সব সামলাতে বাবা একেবারে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ির পরিস্থিতি দেখে মলির অনেকবার মনে হয়েছে পড়াশোনাটা চালিয়ে যাওয়া বোধহয় আর সম্ভব হবে না। বার কয়েক কথাটা বলেছে বাবার কাছে। কিন্তু বাবা তাকে অনেক কঠিন লড়াইয়ের গল্প শুনিয়েছে। তার নিজের জীবনের লড়াইয়ের গল্প, শূন্য থেকে শুরু করে হারা যুদ্ধ জিতে যাওয়ার গল্প। সেসব গল্প শুনতে শুনতে মলির মনে হয়েছে সে কি চেষ্টা করলে পারবে না বাবার মত লড়াই করতে! তারপর কোনওভাবে লড়াইটা যদি একবার জিততে পারে, তাহলে বাবার পাশে দাঁড়াবে যোগ্য সন্তানের মত। তখন আর সবাইকে এত কষ্ট করতে হবে না। এইসব সাত সতেরো ভেবে পড়াশোনাটা ছেড়ে দিতে পারেনি মলি। এতদিন তবু বাবার নিয়মিত কাজ ছিল বলে অতটা অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এখন সব কিছু এমন ওলটপালট হয়ে গিয়েছে যে তাল মেলানো কঠিন শুধু নয়, প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কলেজের দাদারা রোজই আশার বাণী শোনাচ্ছে—তোর ফি মুকুবের দরখাস্ত আমরা যত্ন করে রেখে দিয়েছি। যেদিনই ম্যাডাম আসবেন, ওনার টেবিলে আমরা পৌঁছে দেব। তুই একদম চিন্তা করিস না। মলি মাঝে মাঝে কলেজ যায়। গেটে দাঁড়িয়ে থাকা সিকিউরিটি কলেজে আসার কারণ জানতে চাইলে কোন সদুত্তর দিতে পারে না। কয়েকজন দাদা নিয়ম করে গেটের বাইরে এসে দাঁড়ায়। আর ধৈর্য্য ধরতে বলে মলির মত ঘুরঘুর করতে থাকা বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়েকে।

একদিন হঠাৎ গেটের সামনে মলির সাথে দেখা হয়ে যায় রতনের। রতন যে এই কলেজে পড়ে তা মলি শুনেছিল। কিন্তু সে যে ওই দাদাদের মধ্যে একজন, সেটা মলির জানা ছিল না। রতন মলির বাড়ির কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকে। বেশ বড়োলোকের ছেলে। রতনের বাবার একটা তেলের ঘানি আছে, ওদের বাড়ির নীচেই। পাশে একটা মুদিখানার দোকান। বেশ রমরমা ব্যবসা ওদের। মলিকে দেখেই বেশ নায়কের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে রতন।

"কিরে মলি? তোর কি সমস্যা হয়েছে?"

এত যত্ন করে সহানুভূতির সাথে রতন মলির সমস্যা জানতে চাইছে দেখে মলি আশায় বুক বাঁধে।

"দেখো না পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করার জন্য যে টাকাটা জমা করতে হবে, সেই টাকা আমি কিছুতেই যোগাড় করতে পারছি না।"

"ফি মুকুবের দরখাস্ত করিসনি?"

"করেছি তো! দেখো না দাদারা বলছে ম্যাডাম নাকি আসছেনই না, তাই আমার দরখাস্তটা কিছু করা যাচ্ছে না।"

"ঠিক আছে তুই বাড়ি যা, আমি দেখে নিচ্ছি। এই রতন যখন আছে তুমি কোন চিন্তা করবি না।"

বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি চলে এল মলি। রতন যখন এত বড় মুখ করে বলল তখন নিশ্চয়ই ব্যবস্থা একটা হবে। ফটিকও মেয়ের কথায় একটু আশ্বস্ত হয়। রতনের বাবা কানুদার সঙ্গে ফটিকের দীর্ঘদিনের পরিচয়। খুব সহজ সরল ভালো মানুষ। শুধুমাত্র পরিশ্রমের ওপর ভর করেই এতবড় ব্যবসা তৈরি করেছে নিজে হাতে। একটুও অহংকার নেই। একেবারে মাটির মানুষ।

দিনদুয়েক পর রতন সটান হাজির মলিদের বাড়িতে। তাকে দেখে মলি আর ফটিক যেন আকাশের চাঁদ পেল। সব সমস্যার বুঝি এক্ষুনি সমাধান হয়ে গেল।

"হ্যাঁ বাবা রতন, ব্যবস্থা কিছু হল?"

"কি হবে বলোতো কাকু! এই ম্যাডাম তো কলেজের দিকই মাড়াচ্ছেন না। আমরা তো কোন কথাই বলতে পারছি না। শুনলাম আজ নাকি উনি আসবেন, তাই আজ আমরা ওনাকে ঘেরাও করব ঠিক করেছি।"

ঘেরাও শব্দটা শুনেই ফটিকের বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ে গেল প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। নিজে কলেজে পড়ার সময় কারণে অকারণে এই ঘেরাও আর তারপরের সব বিচিত্র ঘটনা, বহুবার দেখেছে ফটিক। ঘেরাও শেষে হাসপাতালে নিয়ে ছুটেছে বন্ধুবান্ধবদের। অশ্রাব্য গালিগালাজ মুখ বুঁজে শুনতে দেখেছে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের।

"এই জন্যই তো মলিকে বলতে এলাম যদি কনশেসান চাস, তাহলে আজ আমাদের সাথে আন্দোলন কর। না হলে কিচ্ছু করা যাবে না।"

রতনের কথা শুনে মলির চোখ ছানাবড়া। বলে কি রতন? অন্দোলন! কলেজে পড়াশুনা করা ছাড়া আর কোন কিছুর সাথে নিজেকে জড়ায়নি মলি। ভালো গানের গলা থাকায় নিজের বিভাগে মাঝে মাঝে দু-একবার গান গেয়েছে তাও ম্যাডামদের বিস্তর অনুরোধের পর। সেই মলি করবে আন্দোলন! অসম্ভব। ফটিকও প্রথমটায় বেঁকে বসে।

"দরকার নেই কনশেসান। তার জন্য এসব ঝামেলায় পড়তে হবে না তোকে।"

বাপবেটিতে কেমন যেন দোলাচলে পড়ে গেল। অথচ যে টাকাটা জামা করতে হবে সেটা যোগাড় করা যে কোনওমতেই সম্ভব নয় তা ফটিক খুব ভালো করে জানে। তার উপরে কয়েকমাসের মধ্যেই মলির উচ্চমাধ্যমিক। রত্ন যেভাবে বলে গেল তাতে আন্দোলন খুব মারাত্মক কিছু হবে বলে তো মনে হল না। তাহলে কি মলি যাবে কলেজে আন্দোলন করতে? সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মলিকে আন্দোলনে যাওয়ার অনুমতি দিয়েই দিল ফটিক।

দুরুদুরু বুকে কলেজের সামনে পৌঁছাল মলি। আজ কলেজের চেহারাটা অন্যরকম। দাদাদের দাপটে সিকিউরিটিরা জড়োসড়ো। কলেজের গেটে সবার অবাধ প্রবেশের অধিকার। উঠোনটায় গিজ গিজ করছে ছেলেমেয়ে। দেখে বোঝার উপায় নেই নানান নিয়মবিধির জন্য নাকি কলেজটা দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। সারা কলেজ মুড়ে গিয়েছে কাগজের পতাকায়। জায়গায় জায়গায় জটলা। দাদারা সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে আন্দোলন করতে গেলে কি কি করতে হয়, কি কি বলতে হয়, কেমন অঙ্গাভঙ্গি দরকার আরো কত কি! যত সময় যাচ্ছে তত গুঞ্জন ছড়াচ্ছে, ম্যাডাম বোধহয় আজও এলেন না। দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষোভ। কতদিন না এসে থাকবেন।

তুমুল হৈহল্লার মধ্যেই গেট দিয়ে ঢুকল একটা গাড়ি। কেমন যেন একটা তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জায়গায়। খবর ছড়িয়ে গেল ম্যাডাম এসেছেন। মলি অবাক হয়ে দেখল গাড়িটা। আরে! এটা ম্যাডামের গাড়ি! কলেজের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় এই গাড়িটা তো প্রায়ই ঢুকতে দেখেছে সে! তবে যে দাদারা বলে ম্যাডাম কলেজে আসেনই না! গাড়ি থেকে নেমে সটান নিজের ঘরে চলে গেলেন ম্যাডাম। কলেজ চত্বরের এই উত্তপ্ত আবহাওয়া দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হল না তাঁকে। আচমকা কলেজ চত্বরে যেন যুদ্ধ ঘোষণা হল। গগনভেদী চিৎকারে কানপাতা দায় হয়ে উঠল। এই চিৎকারের মধ্যে দিয়ে কি বলতে চাওয়া হচ্ছে কিই বা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝে উঠতে পারল না মলি। একবার ভাবল এসব ঝামেলায় না থেকে বাড়ি চলে যাওয়াই

ভালো। তাতে যদি পরীক্ষা না দেওয়া হয় তো না হোক। কিন্তু বেরোনোর চেস্টা করেও বেরোতে পারল না মলি। দাদাদের নির্দেশে কলেজের গেট বন্ধ করে দিল সিকিউরিটি।

দাদাদের অশ্রাব্য ভাষা, রতনের দাবড়ানি আর কনশেসানের ক্ষীণ আশায় কেমন যেন চক্রব্যূহে পড়ে গেল মলি। এখন ওদের সাথে গলা মেলানো ছাড়া আর কোন উপায় তার হাতে নেই। হাতে একটা পতাকা ধরিয়ে দিয়ে একপ্রকার ঠেলে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ম্যাডামের ঘরে। যেখানে কানাগলিতে ঢুকে পড়া আরও অনেক মলি কোন কিছু না বুঝে চিৎকার করছে—

আমাদের দাবি মানতে হবে

নইলে গদি ছাড়তে হবে।

প্রচণ্ড চেঁচামেচি, পতাকা নাড়া, বিকৃত অঙ্গভঙ্গি, কুরুচিকর কথা সব মিলিয়ে ওই বন্ধ ঘরটা যেন গ্যাসচেম্বার। সারা কলেজের মধ্যে যে ঘরটা সবচেয়ে বেশি সুরক্ষায় মোড়া থাকে সেই ঘরের চেয়ার, আসবাব সমস্ত এলোমেলো করে যে তাণ্ডব চালাচ্ছে ছাত্ররা, সেই তাণ্ডবের পোশাকি নাম 'আন্দোলন'। প্রচণ্ড সেই তাণ্ডবের মধ্যে অবিচলিতভাবে বসে আছেন ম্যাডাম একা। ছাত্রদের দিকে তিনি যে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন, তাতে তার সম্পর্কে বলে যাওয়া কটুকথাগুলো শুনতে আর কারো না লাগুক মলির খুব খারাপ লাগছে। বড় অসহায় লাগছে নিজেকে। ম্যাডাম দেখে কেন যেন মনে হচ্ছে ওনার কাছে মলি যদি সরাসরি আসার সুযোগ পেত তাহলে তাকে এই 'আন্দোলন'-এর সরিক হতে হত না। মলির এক সিনিয়র দিদি দু'একবার চেঁচিয়েই চুপ করে গেল। মলি তার দিকে তাকাতেই সে বলল, "গতবছর পরীক্ষার আগে আমি ম্যাডামের সাথে দেখা করেছিলাম। ম্যাডাম কিন্তু আমার অনেকটা কনশেসান করে দিয়েছিলেন। এবার দেখা করতেই পারলাম না। এ কথাটা বার বার মলিরও মনে হচ্ছে। কোনভাবে ম্যাডামের সাথে দেখা করতে পারল না তারা। পারলে হয়তো......।

'আন্দোলন'-এর সুর ক্রমশঃ চড়া হচ্ছে। যে দাবিতে আন্দোলন হবে বলে তাদের ডেকে আনা হয়েছিল, সেই দাবি যে আদৌ উঠছে না তা নিশ্চিত বুঝতে পারছে গোলকধাঁধায় পড়ে যাওয়া একাধিক মলি। ম্যাডামের পাশে থাকার জন্য কাউকে ভিতরে আসতে দেওয়া যাবে না। এটা দাদাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। হঠাৎ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন আরও দুজন ম্যাডাম। বেশ খানিকটা দাদাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করেই। ম্যাডামের পাশের চেয়ারে এসে বসলেন তাঁরা। ছাত্রদের ভাবগতিক দেখে তাঁরাও যথেষ্ট বিরক্ত। মলি হঠাৎ খেয়াল করল আরে ইনিই তো তার বিভাগের সেই ম্যাডাম যিনি ভীষণ ভালো গান করেন এবং বিভাগের সমস্ত অনুষ্ঠানে সব্বাই তাঁকে গান গাইতে অনুরোধ করেন। বিভাগে নিয়মিত এবং মনোযোগী ছাত্রী হিসেবে মলিকে সবাই জানে। এখন এই আন্দোলনের মধ্যে তাকে দেখে তার সম্পর্কে কি ধারণা হবে ম্যাডামের? আর কি সেই স্নেহ সেই ভালোবাসা মলি পাবে বিভাগের অধ্যাপকদের কাছ থেকে। নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ, লজ্জা হতে লাগল মলির। একটু সুবিধা পাওয়ার জন্য একি করে ফেলল সে।

বেশ কয়েকঘণ্টা ঘাম ঝরিয়ে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার পর হঠাৎ কেমন যেন ঝিমিয়ে গেল 'আন্দোলন'। মলিদের প্রতি নির্দেশ এল ময়দান ছেড়ে বেরিয়ে আসার। কোনওমতে ছাড়া পেয়েই কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ির রাস্তা ধরল মলি। বারবার মনে হচ্ছে কিছু না বুঝে কতবড় ভুল পথে পা বাড়িয়ে দিল সে। বিভাগের স্যার ম্যাডামদের সাথেও তো আলোচনা করলে পারত! কত সহানুভূতির সাথে ওনারা দেখেন ছাত্রছাত্রীদের। কি করে এবার গিয়ে দাঁড়াবে তাদের সামনে? বাড়ি পৌঁছেই বাবার কাছে সমস্ত যন্ত্রণা উজাড় করে দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল মলি। মেয়ের এই বিহ্বল অবস্থা দেখে ফটিকও ভেবে পেল না ঠিক কিভাবে মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়।

ঠিক পরেরদিন মলির ফোনে ভেসে উঠল অচেনা একটি নম্বর। উলটো দিক থেকে সুরেলা গলায় একজন বললেন, "আমি নন্দিনী ম্যাডাম বলছি তোমার বিভাগের।" মলির সারা শরীরে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বসে গেল কি বলবে সে এবার ম্যাডামকে! কিভাবে কথা বলবে তাঁর সাথে! ম্যাডামই সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে দিলেন।

বললেন, "তুমি কিসের দাবিতে আন্দোলন করছিলে! তুমি তো বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা কর।"

"ম্যাডাম আমি পরীক্ষার ফি-এর পুরো টাকা...."

কথা শেষ হওয়ার আগেই ম্যাডাম মলিকে বললেন সে যেন অধ্যক্ষকে এটা দরখাস্ত করে সিকিউরিটির কাছে দিয়ে আসে, বিভাগের অধ্যাপকরা বিষয়টা দেখবেন। একটুও দেরি না করে পরের দিনই ম্যাডামের কথামত দরখাস্ত জমা করল মলি। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পরই অধ্যক্ষের ঘর থেকে তার দরখাস্ত ফেরত এলো যার এককোণে লেখা আবেদন মঞ্জুর। মলি অবাক হয়ে ভাবল শুধুমাত্র বিভাগের অধ্যাপকদের সাহায্যে এত সহজে হয়ে গেল যে কাজটা, তার জন্য কি কাঠখড়টাই না পুড়িয়েছে সে! দ্রুত পরীক্ষার ফর্ম ভর্তি করে বাড়ি চলে এল মলি। এবার শুধু একমনে পড়াশুনা। আর কোনোদিকে তাকালে চলবে না।

একটানা পড়তে পড়তে পিঠটা যেন ধরে গেছে। দুপুরের মিঠে রোদ পিঠে লাগিয়ে একটু বারান্দায় বসেছে মলি। সাইকেল নিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো রতন। কানে গোঁজা ইয়ারফোন, মুখ ভর্তি গুটখা আর চুলে বিচিত্র রঙের বাহার। যেন ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস।

"কিরে তুই আর আমার সাথে যোগাযোগ করলি না তো! ফর্মও ফিল আপ করলি না! পরীক্ষা দিবি না এবার?" কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল না মলির। এককথায় উত্তর দিল, "দেব।"

শুরু হয়ে গেল পরীক্ষা। বিচিত্র এক পরীক্ষা। কপালে দই-এর ফোঁটা দিয়ে পরীক্ষার হলে ছোটার তাড়া নেই। ভোর থেকে উঠে বাবার বাজার করে আনা, মার পাতলা করে মাছের ঝোল বানানো, কোন কিছুরই তাড়া নেই। রোবটের মত একটা যন্ত্রের সামনে বসা, স্ক্রিনে ভেসে ওঠা প্রশ্নপত্র দেখে নিজের ইচ্ছেমত কাগজে লেখা। ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে, অনেক সময় হাতে নিয়ে লেখা আর সবশেষ উত্তরপত্র স্ক্যান করে মেল করে দেওয়া। হয়ে গেল পরীক্ষা। পরীক্ষার হল নেই, গার্ডের শ্যেনদৃষ্টি নেই, পরীক্ষার সময় বলে দেওয়া ঘণ্টা নেই, হুড়োহুড়ি করে লুস শীট চাওয়া নেই, কিছু নেই। এর নাম অনলাইন এক্সামিনশেন।

আজ মলির পরীক্ষা নেই। একটু জিরিয়ে নিচ্ছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। দূর থেকে দেখল রতন আসছে সাইকেল নিয়ে। মলির কেমন খটকা লাগল। ওর না থাকলেও রতনের তো আজ পরীক্ষা থাকার কথা! কাছে আসতেই মলি জিজ্ঞেস করে, "তোমার আজ পরীক্ষা আছে তো! পরীক্ষা দিচ্ছ না।"

"ধুস আমি ফর্ম ফিল আপই করতে পারিনি।"

"সেকি! তোমার তো কোনো অসুবিধা নেই। ফর্ম ফিল আপ করোনি কেন!"

"না না ফর্ম ফিল আপ করবো বলে তো বাবার থেকে টাকা নিলাম। বন্ধুরা বলল চ' কদিন দীঘা ঘুরে আসি। টাকাটা খরচ হয়ে গেল।"

"তাহলে? পরীক্ষা? দিলে না!"

"দেব তো! আবার তো ফর্ম ফিলআপ হবে।"

"কি যে বলো! এরকম আবার হয় নাকি! পরীক্ষা শুরু হয়ে দুদিন পরীক্ষা হয়ে গেল তারপর আবার...."

"মলি, তুই না একদম বাচ্চা। কিস্যু জানিস না। শুরু হয়ে গেছে তো কি হয়েছে! আমরা বিন্দাস পরীক্ষা দেব। যখন চাইব তখন দেব। আমাদের জন্য বার বার পরীক্ষা হবে। তুই দেখিস। কেন জানিস!"

"কেন?"

"কারণ আমাদের হাতে যাদু আছে। আমরা সব রোগের ওযুধ জানি। আমাদের সাথে ব্রহ্মাস্ত্র আছে যে অস্ত্রকে সবাই ভয় পায়।"

"কি এমন অস্ত্র গো রতন, যাকে সবাই ভয় পায়?"

রতন সাইকেল থেকে নেমে গুটখার থুতুটা ফেলে, চুলের মধ্যে একবার হাত চালিয়ে বীরের ভঙ্গিতে বলে, "আন্দোলন।"

রতন কি যেন একটা কুৎসিত গান গাইতে গাইতে চলে গেল। রতনের চেহারাটা চোখ থেকে মিলিয়ে যেতেই মলির মনটা কেমন ভারী হয়ে গেল। মনে মনে ভাবতে থাকল ওর মত হাজার হাজার মলির কথা যারা 'আন্দোলন' এর কথা ভাবতেই পারে না। দাঁতে দাঁত চেপে জীবনের কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যায় তার পরিবারের মত অজস্র পরিবার। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে শর্টকাট এর পথ বেছে নেওয়া যাদের ঘোর

আপত্তি। খোঁজ করলে হয়তো দেখা যাবে তার মত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 'আন্দোলনকারী'দের থেকে অনেক বেশি।

মলির মনে হয় তার মত ছাত্রছাত্রীদের একজোট হওয়া দরকার। 'আন্দোলন' এর নামে শত শত পরিবারের এই লড়াইকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ছাত্রদের প্রতি সমাজের বক্রদৃষ্টি তৈরি করার এই জঘন্য চেষ্টার একটা সমুচিত জবাব দেওয়া উচিৎ। মলি মনস্থির করে পরীক্ষার পর সে আবার কলেজে যাবে, তার প্রথম কাজ হবে তার মত ছাত্রছাত্রীদের খুঁজে বের করা। সেই সব সহপাঠী, যারা তাদের নিজেদের মত করে নিজেদের সমস্যা তুলে ধরার সাহস রাখে। ছাত্র হিসেবে তাদের অধিকার, দাবিদাওয়া সঠিক জায়গায় পেশ করার ধৈর্য্য রাখে। পাকদণ্ডীর রাস্তা না বেছে নিতে পারে সমতলের সহজ পথ। সেই পথ, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের সাথে শিক্ষকদের আবহমান কাল ধরে চলে আসা মধুর সম্পূর্ণ অনেক মনোরম করে তোলে শিক্ষাপ্রাঙ্গনের পরিবেশ। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যারা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে রুচিসম্মত, পরিণত, যুক্তিপূর্ণ লড়াই। যে লড়াই রচনা করতে পারে ইতিহাস। যে লড়াই আত্মপ্রকাশ করে সত্যিকারের 'ছাত্র আন্দোলন' হিসেবে।

রসায়নে খুন

অয়ন পেখুয়া *(সেমেস্টার ফোর, বিজ্ঞান বিভাগ)*

****

—'তাহলে কখন যাবি?' প্রশ্নটা করলাম আমি।

—'আজ বিকেলেই।' বলল অনুপম।

আমি অভীক, অনুপমের বন্ধু। আমরা দুজন একই কলেজ থেকে পড়াশোনা করছি। অনুপম কেমিস্ট্রি অনার্স সম্পূর্ণ করে এখন মাস্টারস করছে। আর আমি বাংলা সাহিত্যে। আজ দুপুর ১টা নাগাদ অনুপমের মাসি মারা যাওয়ায় আমার এই প্রশ্ন। গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে মৃত্যু। খুবই বেদনাদায়ক।

যাইহোক, কথামতো বিকেল ৩টে-য় আমরা পৌঁছালাম। গিয়ে যে ঘটনাটা শুনলাম তা এইরকম—

দুপুরের রান্না করতে অনুপমের মাসি অর্থাৎ ঊর্মিলাদেবী রান্নাঘরে ঢোকেন ও যথারীতি রান্না শুরু করেন। সেই সময় বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ রান্নাঘরে পরপর দুটি জোরালো আওয়াজ হয়। তখন বাড়ির সব সদস্য যে যার কাজ ফেলে রান্নাঘরের দিকে ছুটে আসেন ও সঙ্গে আশেপাশের বাড়ির কিছু লোকজনও। সারা ঘরে আগুন জ্বলতে থাকায় সবাই মিলে আগুন নেবানোর কাজে হাত দেয়। স্বাভাবিকভাবেই আরও লোকজন এসে ভিড় করে ও আগুন নেভানোর কাজে হাত দেয়। কিছুক্ষণের চেষ্টাতে আগুন সম্পূর্ণ নিভলেও, ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। সবার প্রথম ঊর্মিলাদেবীকে দেখতে পায়, তাঁর ছেলে সোমক। মুখটাই সবচেয়ে বেশি পুড়েছে, বাকি শরীরও প্রায় আধপোড়া হয়ে গেছে। মাকে সেই অবস্থায় দেখেই, স্বভাবতই সে মূর্ছা যায়।

তারপর একজন ডাক্তারকে খবর দেওয়া হলে দশ মিনিটের মধ্যে তিনি এসে ঊর্মিলাদেবীর হাতের নাড়ি পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন তিনি আর বেঁচে নেই।

পুলিশও এসেছে। পুলিশ এসেই স্বাভাবিকভাবেই মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেন। তারপর রান্নাঘরটিকে ভালোভাবে সার্চ করতে থাকেন ও অনুমান করার চেষ্টা করেন ঠিক কি কারণে এই দুর্ঘটনা। তারপর গ্যাস সিলিণ্ডার ব্লাস্ট করার কথা সকলকে জানান এবং বলেন গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করার আওয়াজেই তার হার্ট অ্যাটাক হয় ও ঊর্মিলাদেবীর অকাল মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অনুপম তখন এগিয়ে এসে তাদের বাধা দেয় এবং জানায় যে এটিকে শুধু সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে মৃত্যু বলতে নারাজ। কারণ, গ্যাসে সিলিন্ডার ব্লাস্ট হলে তো একটি আওয়াজ হবার কথা। কিন্তু দুটি জোরালো আওয়াজ স্পষ্ট আলাদাভাবে শোনা গিয়েছিল। এর অর্থ কী?

পুলিশের এ বিষয়টি অজানা থাকার, বিষয়টি শোনার পর আবার তারা নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আসলে আমার এই মেধাবী বন্ধুটির পড়াশোনার পাশাপাশি গোয়েন্দাগিরিতেও সমান আকর্ষণ। শুধু তাই নয়, দুটি ছোটো কেস সমাধানও করেছে ইতিপূর্বে। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তীক্ষ্ণ না হলেও জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও অনুমান ক্ষমতা বেশ ভালো। তাই, এখানেও সেই গোয়েন্দাগিরির ভূত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

এদিকে পুলিশরাও ভেবে উঠতে পারছেন না। তাই তারা পুনরায় রান্নাঘরটিকে ভালোভাবে তল্লাশি চালান ও পোড়া-আধপোড়া সমস্ত খাবার, জিনিসপত্র সব সিল করে নেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় আওয়াজটির কারণ তখনও অজ্ঞাতই থেকে যায়।

অনুপমও সারা সন্ধ্যেটা ভাবতে থাকে। একবার সে বিড়বিড়ও করে ওঠে, "আচ্ছা একটি আওয়াজ যদি সিলিন্ডার ব্লাস্ট এর হয়, তাহলে আরেকটি কিসের! তার মানে কি তার আগে আরও কিছু ব্লাস্ট করেছিল? যার ফলেই সিলিন্ডারটি ব্লাস্ট করে! ....আচ্ছা, সেদিন ঊর্মিলাদেবী কি রান্না করছিলেন? সেখান থেকে কি কিছু আন্দাজ করা যেতে পারে?"

কথাগুলি প্রায় একনাগাড়ে বিড়বিড় করে, সে আমাকে জিজ্ঞেস করে "বাড়ির কাকে জিজ্ঞেস করা যায় বলতো এ ব্যাপারে?" বাড়ির লোকজনের যা অবস্থা,

উর্মিলাদেবীর এমন অকালপ্রয়াণে সবাই মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় দুপুরের খাবার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্যে বাড়ির চাকর রামগোপালকেই উপযুক্ত মনে করলাম। সুতরাং, তাকে ডেকে একথা জিজ্ঞেস করতে সে জানাল, খিচুড়ি, আলুরদম ও ডিমের ঝাল হওয়ার কথা ছিল। অনুপম আবার ভাবা শুরু করল। বলে উঠল, 'খিচুড়ি তৈরিতে তো প্রেসার কুকার ব্যবহৃত হয়। তাহলে কি সেটাই আগে ব্লাস্ট করেছিল?'

অনুপম তার এসব ভাবনার কথা জানায় পুলিশকর্তাটিকে। তখন তিনি জানান 'আমরা প্রেসার কুকার পরীক্ষা করেছি। প্রেসার কুকার ব্লাস্ট করেনি। কুকারের সেফ্‌টি ভাল্‌বও সম্পূর্ণ অক্ষতই আছে।' এই ঘটনা কেসটিকে আবার জটিল করে দিল। 'তাহলে কি বাকি রান্নাগুলো কোনোটা করার সময় প্রথমবার বিস্ফোরণটি ঘটেছিল?' এটা বলার পর অনুপম আরও বলল, 'মনে হয় খাবারে অথবা খাবারে যে মশলাপাতি ব্যবহার করা হয়, তাতে এমন কিছু মেশানো হয়েছিল, যা প্রথম বিস্ফোরণের জন্যে দায়ী হতে পারে।' তখন পুলিশকর্তা রান্নাঘর থেকে যেসব মশলাপাতি পাওয়া গেছিল, সেগুলি ফরেনসিক টেস্টের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

তার পরের দিন সকালে, অর্থাৎ অনুপমের মাসির সৎকার-এর তিনদিনের মাথায় বোধহয় কেসটির আসল দিকটি উদ্‌ঘাটিত হল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের পর, যখন মশলাপাতির সেই ফরেনসিক রিপোর্ট অনুপম হাতে পেল, তখন প্রায় লাফিয়ে বলল, "ইস! এটা আমার মাথায় এলোনা! 2, 4, 6 ট্রাই-নাইট্রেফেনল বা পিকরিক অ্যাসিড যেটা আলুরদম রান্নার সময় ব্যবহৃত হয়েছিল এবং ওই তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে বিস্ফোরণটি ঘটিয়েছিল। এটি একপ্রকার হলুদবর্ণের কেলাসিত পদার্থ।" এরপরে আমারও আর বুঝতে বাকি রইল না যে, কেউ এই হলুদ বর্ণের পদার্থটিকে রান্নার মশলা হলুদগুঁড়োর সাথে মিশিয়ে দেয়, তারপর কিছুক্ষণ পরই প্রথম বিস্ফোরণ ও তারপর সেই আগুন ছড়িয়ে রান্নার গ্যাস ও সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে দ্বিতীয় জোরালো শব্দ হয়েছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হল—ঘটালো কে? অনুপমের মেসো অর্থাৎ উর্মিলাদেবীর স্বামী মোহন চৌধুরি। তিনি বই, খাতা এসবের ব্যবসা করেন। ও ছেলে সোমক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ফার্স্ট ইয়ার। এবং মোহনবাবুর ভাই মহেশ চৌধুরী, যিনি একটি কলেজে কেমিস্ট্রির প্রফেসর। তার স্ত্রী কুমুদিনী চৌধুরী একজন শিক্ষিতা গৃহবধূ ও তার ছেলে পুষ্পল পরের বছর উচ্চমাধ্যমিক দেবে। ওনাদের মা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন ও বাবা দু'সপ্তাহ হল দেশের বাড়ি ঘুরতে গিয়েছেন। আর আছে সেই রামগোপাল নামের পুরোনো চারকটি।

এরপর আরও একটি রাত কাটল। তার পরদিন সকাল থেকে শুরু হল পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ। স্বাভাবিক দুর্ঘটনা যে এটা নয়, তা জানিয়ে দেওয়া হল। তার সঙ্গে এটাও যে এটি একটি পরিকল্পিত খুন। সেদিন রান্নাঘরে একাই রান্না করছিলেন ঊর্মিলাদেবী ফলে রান্নাঘরে ঢুকে মশলার এসব মেশানোর কাজ বাইরের লোকের পক্ষে করা সম্ভব বলে মনে হল না। ব্রেকফাস্টে হলুদ-এর ব্যবহার হয়নি। যদিও আগের রাতে ডিনার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছিল। অর্থাৎ ডিনারের পর থেকে শুরু করে পরের দিন লাঞ্চ-এর মধ্যেই কেউ এই কাজটি করেছিল।

আমি, অনুপম ও সোমক বাদে বাকি পাঁচ জনকে সেদিন জেরা করল পুলিশ। যার মধ্যে অবশ্য পুষ্পলকে বাদই দেওয়া যায়, কারণ তাকে সামান্য কিছু কথাই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। অনুপম বলেছিল, 'পিকরিক অ্যাসিড হল উচ্চতর জৈবরসায়নের একটি অংশ। সুতরাং তার সম্বন্ধে কেমিস্ট্রির প্রফেসর মহেশবাবুর জানার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। তাই, তাঁকেই জেরা করা হয়েছিল সবচেয়ে বেশিক্ষণ ধরে। এবং তাঁর কাছ থেকে যেগুলি জানা গেছিল, সেগুলি হল এরকম, সেদিন সকাল ৭টা নাগাদ তাঁকে কলেজের জন্যে বেরোতে হয়। সেদিন সারাদিন তিনি কলেজেই ছিলেন এবং তিনি ওইদিন ঘুম থেকে উঠেছিলেন সকাল ছ'টায়, তারপর থেকে তিনি রান্নাঘরে যাননি এবং স্ত্রীর এনে দেওয়া চা-বিস্কুট দিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে তিনি কলেজ যান। তার আগের দিনও রাত আট টায় বাড়ি ফিরেছিলেন ও দশ টায় ডিনার করেই শুয়েছিলেন।

এরপর, তাঁর স্ত্রী কুমুদিনীদেবীর সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের পর তাঁর স্বামীর সব কথাই সঠিক বলে বোঝা যায়। তা সত্ত্বেও অনুপম ও পুলিশকর্তা, মহেশবাবু ছাড়া আর কাউকেই খুনি হিসেবে ভাবতে পারলেন না। মোহনবাবু অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ, পাশাপাশি স্ত্রীর অকাল প্রয়াণে তিনি যথেষ্ট শোকস্তব্ধ। তাঁর পক্ষে এ খুন সম্ভব না। আর, কুমুদিনীদেবী তো একজন গৃহবধূ, তাঁর পক্ষেও এরকম একটা যৌগ-এর নাম জানারও কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আর, রামগোপাল আর বিজ্ঞান তো আকাশ-পাতাল।

তবে মোহনবাবুকে জেরা করবার সময়, আরও একটি বিষয় সামনে এসেছিল, তা হল এই কিছুমাস আগে তাঁর বাবার সঙ্গে ভাই মহেশবাবুর কিছু অশান্তি ও কথা কাটাকাটির দরুণ তিনি মহেশবাবুর প্রাপ্ত সম্পত্তির বেশ অনেকখানি কমিয়ে মোহনবাবুর ভাগে করে দিয়ে একটি নতুন উইল করেন।

আবার সেদিনই দুপুরে রামগোপাল বাড়ির পিছনদিক থেকে একটি সন্দেহজনক শিশি পড়ে থাকতে দেখে অনুপমের কাছেই নিয়ে আসে। অনুপম দেখেই বুঝেছিল পিকরিক অ্যাসিডের এবং এটা পড়েছিল মহেশবাবুর ঘরের পিছনদিকের জানলার সোজাসুজি অনেকটা দূরে। যার ফলে, সেদিনই খুনি এবং খুনির মোটিভ সব পরিষ্কার হয়ে যায়।

কিন্তু সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত অনুমান তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল পরের দিন আরেকটি মৃত্যুতে। এবং আমাদের অনুমান করা খুনি মহেশবাবুর মৃত্যুতে। এটিও অস্বাভাবিক মৃত্যু। ঘরের বাথরুমে অস্বাভাবিক শ্বাসকষ্টে মৃত্যু। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল এটি আত্মহত্যা। কিন্তু, পরের দিন ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা গেল বিষাক্ত মিথেন গ্যাস থেকে শ্বাসকষ্ট হয়ে মৃত্যু। কিন্তু বাথরুমে মিথেন গ্যাস আসবে কোথা থেকে? তাহলে কী আরও একটি খুন? তাহলে খুনি কে? বাড়িতে মাত্র ছ'টি মানুষ। তা সত্ত্বেও খুনিকে শনাক্ত করতে এত কসরত করতে হয়নি পুলিশকর্তাদের এর আগে। তাহলে খুনি কি বাইরের লোক!

কেসটি ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছিল। পুনর্বার জেরার সময় জানা যায়, মোহনবাবু সেদিন বাড়িতে ছিলেন না; তাঁর স্ত্রী শ্রাদ্ধের ব্যাপারে কথা বলতে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। আর মহেশবাবুর মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী কুমুদিনীদেবী যেন একটু বেশিই ভেঙে পড়েছেন। সারাক্ষণ শুধু কেঁদেই চলেছেন। বহুদিনের পুরনো চাকর রামগোপালও এরকম পরপর দুটি মৃত্যুতে কেমন যেন বাক্যহারা হয়ে গেছে। মহেশবাবুকে খুনি এমনটা ধরে নিয়েই অনুপম ও আমি সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম; অর্থাৎ এই দ্বিতীয় খুনের দিন রাতে। তাই, পরের দিন সকালে আবার যেতে হল আমাদের পুলিশকর্তাদের অনুপমকে বেশ পছন্দও হয়েছে। প্রথম কেসটি সমাধানে সে যথেষ্টই সাহায্য করেছিল। তাই তাকে দেখেই পুলিশকর্তা বলেছিল 'দেখো ভাই, আবার একটা খুন। দেখো তো এটার কোনো কিনারা করতে পারো কিনা!' তাই সেদিন পুলিশদের সার্চ টিমের পাশাপাশি, অনুপমেরও বাথরুমটা ভালো করে দেখার সুযোগ হয়েছিল। যদিও প্রায় দু'ঘণ্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তেমন কিছুই পাওয়া গেল না; শুধু একবার যেন বেসিনের কাছে এসে অনুপমের চোখটা হালকা কুঁচকোতে দেখেছিলাম। এদিকে পুলিশও তাদের দিক থেকে খুনিকে খোঁজার চেষ্টা চলাচ্ছে। এভাবে দুদিন কেটে গেল। অনুপমও সারাদিন ভাবতে থাকে। চলতে থাকে পাশাপাশি নানান বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি, নেট সার্চ। পুলিশ এর মধ্যে আশেপাশের বাড়ির কিছু মানুষকেও জেরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। অনুপম কিন্তু মনে করে এ কোনো বাড়ির লোকেরই কাজ—মোহনবাবু, কুমুদিনীদেবী, সোমক, পুষ্পল, রামলোচন.... কে হতে পারে! সে প্রত্যেকটি সদস্যকে কদিন চোখে চোখে রাখল ও দেখতে থাকল গতিবিধি।

এরপর তিনদিনের মাথায় অনুপম দুপুরে বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠল, "হ্যাঁ! হয়েছে!' আমি জিজ্ঞেস করাতে সে জানাল, "আমি একটা মোটামুটি ভিত্তিযুক্ত অনুমান খাড়া করেছি এবং এর ভিত্তিতেই এগাবো। ঘটনা মিলতে থাকলে খুনি চাপে সত্যি কথা বলবে...আশা করছি।" তাই পুলিশদেরও সেসব কথা খুলে বলে এবং সেদিন রাতে বাড়ির সমস্ত

সদস্যদের ডেকে অনুপম বলতে শুরু করে, "গত দুদিন ধরে আমি বাড়ির সদস্যদের একটু নজরে রাখতে শুরু করি। তখনই দেখি মিস্ কুমুদিনী তাঁর ছেলেকে অর্থাৎ পুষ্পলকে নিয়ে পড়াতে বসেন নিয়মিত। আগেই বলেছিলাম পিকরিক অ্যাসিড উচ্চতর জৈব রসায়নের একটি অংশ। তাই, পুষ্পলের রসায়ন বইয়ে তা থাকার কথা। একটু ঘাঁটাঘাটি করতে পেলামও। ওর মা মিসেস্ কুমুদিনী চৌধুরী নিশ্চয়ই ওকে এটা পড়তে দেখেছিলেন এবং আমার অনুমান পিকরিক অ্যাসিড এর এই বিশেষ ধর্মের কথা তিনি জানতে পারেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় ওই বুদ্ধি খেলে যায় এবং সেই অনুযায়ী প্ল্যানও করে ফেলেন। সেদিন ডিনার-এর পর গিয়ে কোনো এক সময় অথবা সকালবেলা মহেশবাবুর চা আনতে গিয়ে তিনি রান্নাঘরের হলুদ রাখার শিশির সঙ্গে পিকরিক অ্যাসিড গুঁড়ো মিশিয়ে দেন। প্রথমে সন্দেহের তালিকায় তাঁকে বাদ দিয়ে ভুল করেছিলাম—সম্পত্তি না পাওয়ার আক্রোশ তাঁকে বেশি করে গ্রাস করেছিল। এবং দ্বিতীয়ক্ষেত্রেও মোহনবাবুকে মারার জন্যেও অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তিনি।'

'আমাকে?' অবাক স্বরে উচ্চারণ করে উঠলেন মোহনবাবু। ঘরের বাকি সদস্যরা তখন বিহ্বল হয়ে শুনছে। কুমুদিনীদেবীও স্তম্ভিত হয়ে বসে আছেন। অনুপম একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, "এবার দ্বিতীয় খুনটায় আসা যাক। মহেশবাবুর মৃত্যুর পর সেদিন বাথরুমের বেসিনটিতে আমি ছাই রঙের ধুলোর মতো কিছু পড়ে থাকতে দেখি। প্রথমে একটু কেমন লাগলেও বিষয়টি এড়িয়ে যাই। পরে যখন মিথেন গ্যাসের কথা জানতে পারি ফরেনন্সিক রির্পোট থেকে, তখন একটু বই ঘাঁটাঘাঁটি করে ও ভেবে মনে হয় অ্যালুমিনিয়াম কার্বাইড পাউডার এর কথা। এবং নেট সার্চ করে জানতেও পারি এটি ছাই রঙের ধুলোর মতো এক প্রকার পাউডার; যার ধর্ম ঘরের উষ্ণতায় জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে দ্রুত মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করা। ব্যস! তারপরেই আমার কাছে সবটাই পরিষ্কার হয়ে যায়। কুমুদিনীদেবী জানতে, মোহনবাবু প্রতিদিন সবার আগে ডিনার করেন ও তারপর মুখ ধুতে যান। কিন্তু, মোহনবাবু যে ওইদিন বাড়িতে ফিরবেন না, অর্থাৎ দোকান থেকে সোজা শ্বশুরবাড়ি চলে যাবেন এই বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না। আবার সেইদিনই মহেশবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন ও ডিনার করতে যান। ফলে ওই রোষ গিয়ে মহেশবাবুর উপর। কুমুদিনীদেবী বেসিনে যে অ্যালুমিনিয়াম পাউডার বেশি করে ছড়িয়ে রেখেছিলেন, খাওয়ার পর মহেশবাবু বেসিনে হাত ধুতে গেলে, কৌতূহলবশতঃ কল চালিয়েই গন্ধ শুঁকতে যান এবং হঠাৎ বিশেষ পরিমাণে মিথেন গ্যাস সরাসরি নাকে এসে ঢোকায় তিনি শ্বাসকষ্টে মারা যান। তাই কুমুদিনীদেবীর প্ল্যান সম্পূর্ণ ভেস্তে যায়; কিন্তু ভুল মানুষের উপর। কি? তাই তো মিস্ কুমুদিনী চৌধুরী?"

ভুলবশত নিজের স্বামীকে হত্যা করায় তিনি আগে থেকেই অনুশোচনায় ভুগছিলেন। এবার তিনি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেন। আর কিছু বলতে পারলেন না।

অভিশপ্ত কলম

বীরেশ্বর ধানকী *(সেমেস্টার সিক্স, বিজ্ঞান বিভাগ)*

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

অফিসফেরতা অরিন্দমবাবুর তাড়াহুড়ো করার একটা বিশেষ কারণ ছিল। অফিসে থাকাকালীন বিপ্লব চ্যাটার্জী লেনের অ্যান্টিক এন্টারপ্রাইজের প্রোপ্রাইটার সুজিত বোস অরিন্দমবাবুকে বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ দেখা করতে বলেছেন। আসলে অরিন্দমবাবু বিভিন্ন অ্যান্টিক জিনিস কেনেন, বলতে গেলে এটা তাঁর বহু শখের মধ্যে একটা। তিনি শুধু সুজিত বোসের দোকান থেকে জিনিস কেনেন এমন নয়, বিভিন্ন নিলামঘরেও যান মাঝেমাঝে। দামি জিনিস কিনতে তিনি কখনও কার্পণ্য করেননি। তাঁর টাকাপয়সার অভাব নেই, ছেলে-মেয়ে তো নেই, স্ত্রীও বছর চারেক আগে মারা গেছেন সুতরাং তিনি যা আয় করেন, বেশিরভাগই এইসব কেনার জন্য ব্যয় করেন। আর এই করেই তিনি তাঁর বৈঠকখানার অর্ধেক ভরিয়ে ফেলেছেন।

কলকাতার ভিড়ের শনিবারে, ঠেলেগুঁজে কোনোমতে তিনি যখন অ্যান্টিক এন্টারপ্রাইজে উপস্থিত হলেন, তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজতে সামান্যই বাকি, সেই সময় সুজিতবাবু ফাঁকা ছিলেন, বললেন, "কী ব্যাপার মশাই, আপনার যে দেখাই পাওয়া যায় না। তা মশাই ভালো একটা অ্যান্টিক জিনিস এসেছে, নেবেন নাকি? ভালো একটা বিলিতি কলম, বহু বছরের পুরোনো। দাঁড়ান আগে দেখাই।' বলে ভিতর থেকে একটা পুরনো কাঠের বাক্স নিয়ে এলেন, দৈর্ঘ্যে বারো ইঞ্চি, প্রস্থ পাঁচ ইঞ্চিতো হবেই। ভেতরে ফাউন্টেন পেনের অনুরূপ একটা কলম। কলমটার গায়ে দামি কোম্পানীর নাম, কলমটার মালিকের নাম, সাল সোনার জলে এখনও জ্বলজ্বল করছে। অরিন্দমবাবু পড়লেন : অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়, 1915। মানে একশো বছরেরও পুরোনো। তিনি কলমটা কিনেই নিলেন। তবে কলমের মুখটা সামান্য বাঁকা আর নিবটা রূপোর তৈরি। তিনি পুরোনো কালি খুঁজে পেতে কিনলেন। বাড়ি ফিরে কলমটা আলমারিতে সাজিয়ে না রেখে, ব্যবহার করার কথা ভাবলেন। তাই কলমটাও পরিষ্কার করা হল আর কালি ভরে অরিন্দমবাবু দেখলেন কলমটা এখনও কার্যক্ষম। কিন্তু বুঝতে পারলেন না, তিনি কি বিপদে পড়তে চলেছেন।

তিনি ওই কলমে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, পকেটে নিয়ে বেরোতে শুরু করলেন। কিন্তু একটা ব্যাপার তিনি লক্ষ্য করলেন না যে কলমটার সংস্পর্শে এলেই তার রাগ, হিংসার হঠাৎ হঠাৎ প্রকাশ ঘটছে। একদিন অফিসে তাঁর একজন কলিগকে কলমটা ছুরির মতো ধরে মারতে গেলেন। কিন্তু চারপাশের অন্যান্যরা ছিল তাই রক্ষে। না হলে এতক্ষণ তিনি হাজতে। বাড়িতে কলমটা নিয়ে লেখার সময়ও হাত নিসপিস করে, কারোর বুকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য।

কিছুদিন পরে তিনি এই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন কিন্তু কলমটা এত সুন্দর যে তিনি তা ত্যাগ করার চিন্তা পর্যন্ত করতে পারলেন না।

মাসখানেক পর সেই মায়া তাঁকে ত্যাগ করতেই হল। পঁচিশ এপ্রিল বুধবার। সেইদিনের কথা অরিন্দমবাবু জীবনে কখনও ভুলবেন না। অফিসে এত কাজ ছিল যে বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড় ছাড়ার কথা ভাবতেও পারলেন না। জুতো খুলে একেবারে বিছানায়। ঘণ্টা দুয়েক পর তার ঘুম ভেঙে গেল। দুজনের স্পষ্ট কথা শোনা যাচ্ছে না? কিন্তু বাড়িতে তো তিনি একাই, একি! তাঁর ঘরেই দুজন লোক দুটো চেয়ারে বসে কথাবার্তা বলছে। ধীরে ধীরে তাদের গলা সপ্তমে চড়তে আরম্ভ করল। তাদের কথাবার্তা থেকে অরিন্দমবাবু বুঝতে পারলেন একজন অবনী আর একজন সন্দীপ। আর তাদের ঝগড়ার কেন্দ্রে একটি মেয়ে। কিন্তু অরিন্দমবাবু বুঝতে পারলেন না, তারা বাড়িতে ঢুকলো কী করে? আর চোর যদিবা হবে, তবে তারা মালিকের সামনে কোনো একজন পারমিতা নামের মেয়েকে কেন্দ্র

করে ঝগড়া করে কী করে? কিন্তু দুজনের চেহারা, পোশাক দেখে তো মনে হয় তারা ভদ্রঘরের সন্তান। কিন্তু একি! সন্দীপ, অবনীর সামনে রাখা অবনীর কলমটা নিয়ে তার বুকে বসিয়ে তুলে নিল। ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা বেরোতে লাগল। কিছুক্ষণ পর অবনীর মাথা একদিকে হেলে পড়ল। অরিন্দমবাবু দেখেশুনে বোবা বনে গেলেন, চিৎকার করতে গিয়ে দেখলেন গলা শুকিয়ে কাঠ। সন্দীপও হতভম্ব। সে কী করল! একটা মেয়ের জন্য সে তার এতদিনের বন্ধুকে হত্যা করল? অরিন্দমবাবু আর দেখতে পারলেন না, চোখ বুজিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুললেন, কিন্তু একি! সব ফাঁকা। টেবিলে শুধু তাঁর কলমটা পড়ে রয়েছে। ফিনকি দিয়ে বেরোনো রক্তেরও কোনো চিহ্ন নেই ঘরে। কিন্তু তার কলমটা এত লাল কেন? এ যে রক্ত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই অরিন্দমবাবুর। চকিতে তাঁর মনে পড়ল কলমটার ওপরে লেখা অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়। আরে! তার নামও তো অবনী। তাহলে কি ত্রিকোণ সম্পর্ক আর তার জেরে হত্যা। তিনি বুঝতে পারলেন, কলমটা হাতে থাকলে কেন এত হিংসার উদ্রেক হয়। তিনি মনস্থির করে ফেললেন না-আর কলমটা তার নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয়। বাকি রাতটুকু তিনি জেগেই কাটালেন। পরেরদিন সকালে অফিসে যাওয়ার সময় হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গার বুকে ফেলে দিলেন সেই রক্তমাখা অভিশপ্ত কলমটাকে। মনে মনে অবনীর আত্মার শান্তি কামনা করলেন।

অরিন্দমবাবু আবার অফিসে শান্ত, নিরীহ, গোবেচারা করণিকে পরিণত হলেন।

প্রিয়াঙ্কা কাঁড়ার *(সেমেস্টার ফাইভ, বাংলা বিভাগ)*

পর্ণা পাল *(সেমেস্টার থ্রি, বাংলা বিভাগ)*

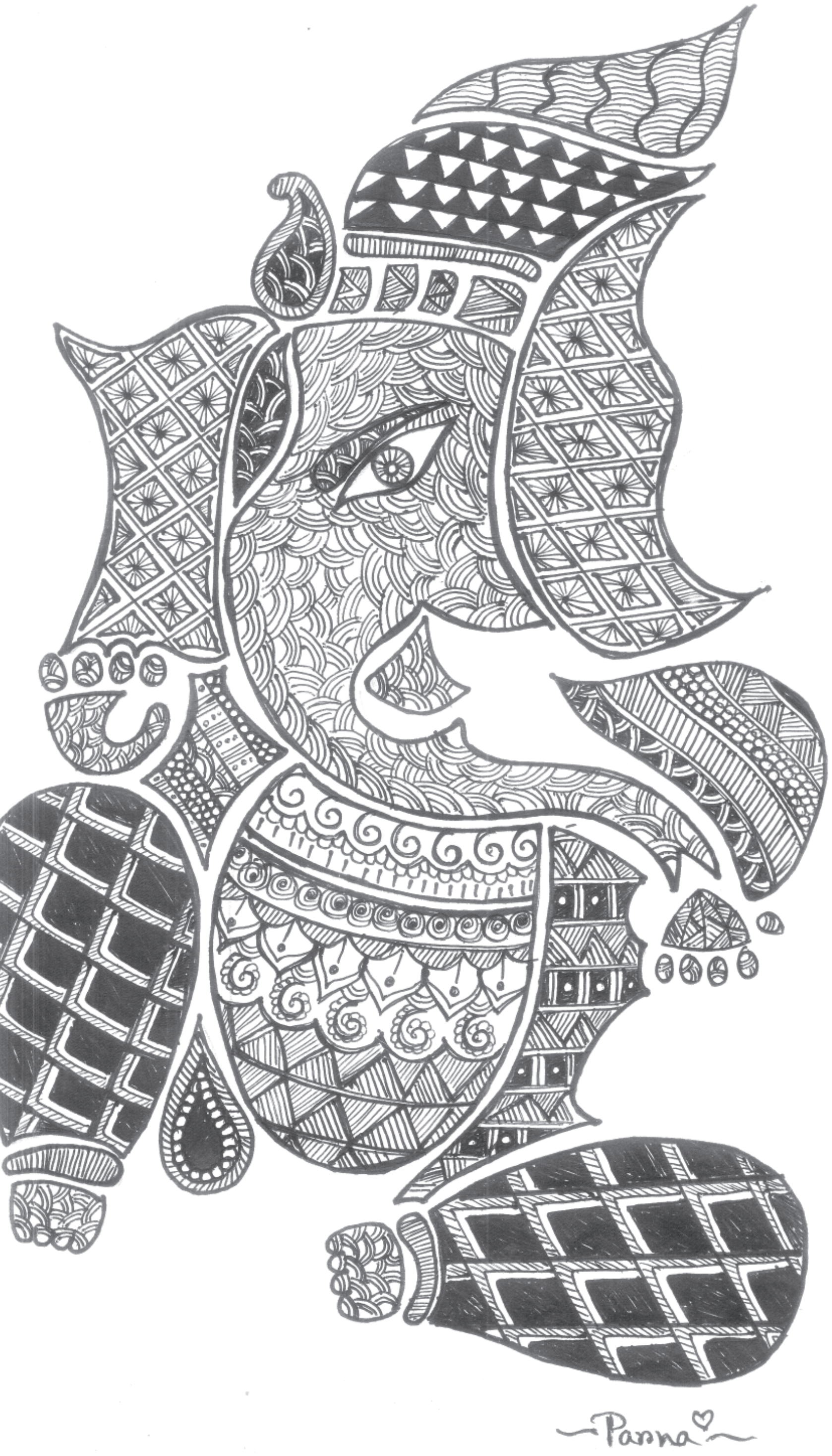

তিয়াসা পান *(সেমেস্টার টু, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)*

তহসিন সাবা *(সেমেস্টার ফাইভ, ইংরেজি বিভাগ)*